সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ই'তিছাম

الاعتصام

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)।

● ৯ম বর্ষ ● ৮ম সংখ্যা ● জুন ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

নারী সংস্কার না ধর্ম, সমাজ ও পরিবার বিনাশের ষড়যন্ত্র ?

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩ ، ذو الحجة و محرم ٤٧-١٤٤٦هـ/ يونيو ٢٠٢٥م العدد: ٨، الجزء : ١٠٤
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬-৪৭ ‖ ঈসায়ী ২০২৫ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- জুন	০৪- যুলহিজ্জাহ	রবিবার	৩.৪৪	৫.১০	১১.৫৬	৩.১৬	৬.৪৩	৮.০৮
০৫- জুন	০৮- যুলহিজ্জাহ	বৃহস্পতিবার	৩.৪৪	৫.১০	১১.৫৭	৩.১৬	৬.৪৪	৮.১০
১০- জুন	১৩- যুলহিজ্জাহ	মঙ্গলবার	৩.৪৩	৫.১০	১১.৫৮	৩.১৭	৬.৪৬	৮.১৩
১৫- জুন	১৮- যুলহিজ্জাহ	রবিবার	৩.৪৩	৫.১০	১১.৫৯	৩.১৭	৬.৪৭	৮.১৫
২০- জুন	২৩- যুলহিজ্জাহ	শুক্রবার	৩.৪৪	৫.১১	১২.০০	৩.১৮	৬.৪৯	৮.১৬
২৫- জুন	২৮- যুলহিজ্জাহ	বুধবার	৩.৪৫	৫.১৩	১২.০১	৩.১৯	৬.৫০	৮.১৭
৩০- জুন	০৪- মুহাররম	সোমবার	৩.৪৭	৫.১৪	১২.০২	৩.২১	৬.৫০	৮.১৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	-২
নরসিংদী	-১	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+২
ফরিদপুর	+৩	+৩	+১
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-২
গোপালগঞ্জ	+৫	+৫	০
মাদারীপুর	+৩	+৩	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১
শরিয়তপুর	+২	+২	-২

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+১
শেরপুর	-২	-১	+৩
জামালপুর	-১	০	+
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৯
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৮
রাঙ্গামাটি	-৩	-৫	-১০
বান্দরবান	-২	-৪	-১১
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	+১	-১	-৫
লক্ষ্মীপুর	০	০	-২
চাঁদপুর	+১	+১	-৩
ফেনী	-১	-২	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৮	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১০
নাটোর	+৪	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৪
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৩
বগুড়া	+১	+২	+৬
নওগাঁ	+৩	+৪	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৩	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	০	+৮
দিনাজপুর	+২	+৩	+১০
গাইবান্ধা	-১	০	+৬
কুড়িগ্রাম	-৩	-১	+৭
লালমনিরহাট	-২	-১	+৮
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+১	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+১	+৩	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৬	০
বাগেরহাট	+৬	+৫	-১
সাতক্ষীরা	+৯	+৮	+২
যশোর	+৭	+৭	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৫
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৪
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+২
নড়াইল	+৬	+৫	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-৩
পটুয়াখালী	+৫	+৪	-৪
পিরোজপুর	+৬	+৫	-২
ঝালকাঠি	+৫	+৪	-৩
ভোলা	+৩	+২	-৪
বরগুনা	+৭	+৫	-৩

▪ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ▪ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৯ম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

জুন ২০২৫
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩২
যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ১৪৪৬-১৪৪৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক
আল-ইতিছাম
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে কুরআন
» মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ (পর্ব-২) ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-৩) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-৪র্থ পর্ব) ০৯
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» কুরবানীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: গুরুত্ব ও মর্যাদা ১১
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
» মুহাররম মাসের তাৎপর্য ও কারবালার ইতিহাস ১৩
-মাহবুবুর রহমান মাদানী
» মুমিনের পরিচয় ও তার গুণাবলি ১৫
-আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ
» মুসলিম বিভাজন: অমুসলিমদের লাভের সুযোগ ১৭
-মো. শাহাবুদ্দিন
» ফিলিস্তীন সংকটে মুসলিম উম্মাহর করণীয় ১৮
-মেহেদী হাসান সাকিফ

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» জীবন-মৃত্যু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা ২০
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» যুদ্ধ নাকি ভয়ংকর নাটক? ২৩
-ইবনু মাসউদ

◈ চিন্তাধারা
» ইসরাঈলি পণ্য বয়কটের ডাক ও প্রসঙ্গ কথা ২৫
-মুস্তফা মনজুর

◈ স্মৃতিচারণ
» মার্চ ফর গাযা এবং কেরানীগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা ৩১
» বাংলাদেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ৩৪
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ মনীষীদের জীবনী
» প্রফেসর ড. সাজিদ মীর রাহিমাহুল্লাহ ৩৫
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ হেলথ কর্নার
» গরমে বাড়ছে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি: প্রয়োজন জনসচেতনতা ৩৭
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা ৩৮
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

◈ কবিতা ৪১

◈ সংবাদ ৪৩

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

নারী সংস্কার না ধর্ম, সমাজ ও পরিবার বিনাশের ষড়যন্ত্র?

বাংলাদেশ, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে এটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করি স্বাধীনতা। ২০২৪-এর জুলাই আন্দোলনে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুই হাজারেরও বেশি মানুষ জীবন দিয়েছে। দীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় জনগণের আশা ছিল যে, বর্তমান সরকারের সংস্কার কার্যক্রম দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের পর নতুন সরকার গঠিত হলেও এখনো কোনো গণহত্যার বিচার সম্পন্ন হয়নি।

সম্প্রতি নারী সংস্কার কমিশনের পেশ করা কিছু প্রস্তাবনা জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামোর বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

(১) ‘ধর্ম নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ১১)*। —ধর্মকে নারীর অধিকারহরণের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অথচ ইসলাম ধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নারীর সকল অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। UDHR Article 18 ও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী: ‘প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্মানুযায়ী জীবনযাপনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে’। অতএব, ধর্মীয় পারিবারিক আইন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে না পারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল।

(২) ‘যৌন পেশাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত না করা এবং শ্রম আইনে একে স্বীকৃতি দেওয়া’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ৩৭)*। —সমাজে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে পতিতাবৃত্তিকে বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে নারীদেরকে পণ্যে পরিণত করার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানিতে পতিতাবৃত্তি বৈধ করার পর নারী পাচার ও শিশু ধর্ষণ বহুগুণ বেড়েছে *(CATW, HARVARD LIDS Report)*। Family First, New Zealand-এর গবেষণা অনুযায়ী পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর অপরাধ সংগঠনগুলো নারীদের শোষণে আরও সক্রিয় হয়েছে।

(৩) ‘দশ বছরের অধিককাল বিবাহ হলে, তালাকের পর স্বামীকে স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বিচ্ছেদের সময় সকল সম্পত্তি ৫০-৫০ ভাগাভাগি করতে হবে’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ৪০)*। —বিবাহের ভিত্তিকে দুর্বল করার এমন প্রস্তাবনার মাধ্যমে পুরুষদের আর্থিক দায়বদ্ধতা বাড়ানোর পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধনকেও দুর্বল করা হচ্ছে।

(৪) ‘একজন ব্যক্তি শুধু একজন স্ত্রীই রাখতে পারবে; একাধিক নয়’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ২৪৮)*। —ইসলামী আইন অনুযায়ী পুরুষদের বৈধভাবে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অধিকার রয়েছে। এই প্রস্তাব ব্যক্তির ধর্মীয় অধিকারকে খর্ব করার শামিল এবং বৈধ রাস্তার পরিবর্তে পরকীয়া ও ব্যভিচারকে উৎসাহিক করে।

(৫) ‘বাল্যবিবাহ আইন ২০১৭-এর বিশেষ ধারা বাতিল করতে হবে’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ৫৪)*। —২০১৭-এর এই আইনে বিশেষ পরিস্থিতিতে বাল্যবিবাহের বৈধতা দেওয়া ছিল। এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ন্যূনতম অধিকারও রাখা হয়নি।

(৬) ‘উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে নারীদের জন্য সমান উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ৪১)*। —ইসলামে পুরুষ ও নারীর উত্তরাধিকার কখনোই লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি। ইসলামী আইনের ভিত্তি ন্যায় ও ইনছাফ। মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ভারসাম্যের সাথে সম্পৃক্ত করে উত্তরাধিকার বণ্টন করা হয়েছে। যা লিঙ্গের ভিত্তিতে পরিবর্তন করা হলে কারও না কারও প্রতি যুলুম হবে। বিশেষ করে পুরুষ বৈষম্যের শিকার হবে।

সম্পাদকীয়-এর বাকি অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়

মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ

*-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল**

(পর্ব-২)

দ্বিতীয় শর্ত হলো আল-কুরআনের দর্শন:
বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতের প্রতি মানুষ যখন আকৃষ্ট হয়, তখন আল-কুরআন তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ 'তোমরা কি দেখো না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?' *(লোক্বমান, ৩১/২০)*। আর এই নেয়ামতসমূহ কারও পক্ষ থেকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় এবং এভাবে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যারা নেতৃত্ব দেবে, তাদের ভয় দূর হয়ে যাবে এবং এমন কিছু অর্জন করবে, যা বিশ্বের কোনো সংস্কার বা বিপ্লব অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, আক্বীদার বিশুদ্ধিকরণ এবং নৈতিকতার পরিশুদ্ধকরণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজকে এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছিল যে, তখন বিভ্রান্তি এবং বিচ্যুতি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আর পৃথিবী একত্ব, বিজ্ঞান ও আদর্শিক জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়েছিল।[১] অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, তত্ত্ব ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কুরআন মানবজাতিকে যে পথ দেখিয়েছে এবং উন্নত ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করেছে, তার চেয়ে আর কোনো মহৎ উপায় নেই। ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-কুরআনের প্রথম বিচ্ছুরিত আলোয় আলোকিত একজন মানুষ সর্বনিম্ন যা অর্জন করতে পারে, একজন সেক্যুলার তা করতে পারে না।

বিশ্বাস এবং আক্বীদা একজন মুমিনের আসল মূলধন। যদি সে এটি হারায়, তবে সে তার জীবনের একমাত্র মূলধন হারায়। বিজ্ঞানী টলস্টয়[২] বলেছেন, বিশ্বাস হলো সেই জিনিস, যার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকে। এর অর্থ হলো বিশ্বাস জীবনের অন্যতম সেরা মূলধন। যদি কোনো ব্যক্তি এটি হারায়, তবে সে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলধন হারায়। এটি কোনো গোপন বিষয় নয় যে, আশ্বাস, আধ্যাত্মিক, মানসিক সুরক্ষা ইত্যাদি এক একটি জীবনের মূল্যবান মূলধন। এদের যে কোনো একটির ক্ষতি মানুষের সুখ এবং স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ জীবন লাভের ক্ষেত্রে অভাব সৃষ্টি করে।[৩]

তাছাড়া যেসব বৈষয়িক মানদণ্ড ও পার্থিব ধারণা কুরআনে কারীমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেগুলো মানুষকে বিশৃঙ্খলা, দুঃখ-দুর্দশা ও যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে দূরে রাখতে অক্ষম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নৈতিক অঙ্গীকার ও নৈতিক ঈমানী শক্তি না থাকলে শান্তি লাভ অসম্ভব হতো। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে (শান্তিতে) প্রবেশ করো' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৮)*। আর শান্তি ও প্রশান্তি আভিধানিক অর্থে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতটি সকল মুমিনকে শান্তি ও প্রশান্তি এবং মহান আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। এই আয়াতের অর্থ থেকে কেবল এই সমাধানই আসে যে, ইসলামের ছায়াতলে দৃঢ় বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধের আনুগত্যের মাধ্যমেই শান্তি অর্জন করা সম্ভব।

অতএব, এটি বলা যেতে পারে যে, আয়াতটি ভাষা, জাতি, সম্পদ, অঞ্চল এবং সামাজিক শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য না করে সকল মুমিনকে পুনর্মিলন, শান্তি, নম্রতা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে এই সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানায় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে বিশ্ব রাষ্ট্রকাঠামোর গণ্ডিতে শান্তির সমাজে বাস করা সম্ভব।[৪]

এছাড়া এমন উপাদান দিয়ে মানুষের শারীরিক কাঠামো গঠিত, যা মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তাই তার হৃদয়ে এমন দৃঢ় যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন, যা তাকে মানুষের মধ্যে আত্মিক সংযোগ তৈরিতে সাহায্য করে, সেই যোগসূত্রটি মহান আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস। বিশ্বাস মানুষকে সামাজিক ভেদাভেদ থেকে সুরক্ষা দান করে এবং সমাজে বিদ্যমান গোলকধাঁধা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, যার স্রোতে সে ভাসমান। বিশ্বাস মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করে তাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যায় যে, সে গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণ এবং পরম পরিণামদর্শী হতে পারে। অতএব, বিশ্বাস এমন একটি শক্তি, যা মানুষকে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।[৫] আর সর্বোত্তম কাজ তথা সর্বজনীন ন্যায়বিচার করতে পারে এবং তার মুমিন ভাইয়ের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

ঈমান স্বয়ং আত্মার মূলধন, বরং এটি মূলধনের সম্ভাব্য বাহ্যিক কাঠামোর প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মহান আল্লাহ

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ১৩/১৩৫।

২. একজন রাশিয়ান গবেষক ও সাহিত্যিক; বিশ্বের নামকরা লেখকদের একজন।

৩. শহীদ মুর্তজা আল-মাতহারী, ধর্মীয় ও সামাজিক ভাষণ, পৃ. ২৭১।

৪. আল-ফযল বিন হাসান আত-ত্ববরিসী, মাজমাউল বায়ান, ২/৪৪-৪৫।

৫. কার্লন ওয়েলসন, রিহলাতুন নাহওয়াল বিদায়া, পৃ. ৪৫০।

বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের পথ দেখাব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? আর তা হলো তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে’ *(আছ-ছফ, ৬১/১০-১১)*। কুরআনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানকে ব্যবসা, লাভজনক পুঁজি ও বাণিজ্য বলে অভিহিত করেছেন। মুনাফার উদ্দেশ্যে পুঁজি ব্যয় করতে আগ্রহীর কথা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতে বিশ্বাসের ব্যবসায় জীবনকে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করতে বলা হয়েছে। এই ব্যবসার বিষয়কে আল্লাহ তাআলা আরও মহিমান্বিত করে বলেছেন, এটি একটি মহান মর্যাদার ব্যবসা এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফা যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তির রক্ষাকবচ।[৬]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষ নৈতিকতা জানা এবং নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করার পূর্বে বস্তুবাদ সম্পর্কে জানত। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি বলেন যে, সম্পদ জীবনের মূলধন; শ্রোতা এই বক্তব্যের বৈধতা উপলব্ধি করে এবং এর মূল্য জানে। কিন্তু একইভাবে, সচ্চরিত্র ও নৈতিক গুণের চর্চা জীবনের আরেকটি মূলধন—যা সুখ এবং পরিপূর্ণতা লাভে অনুপ্রাণিত করে, যার প্রভাব সম্পদের প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মানুষ যত তাড়াতাড়ি সম্পদের গুরুত্ব বুঝে, তত তাড়াতাড়ি নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। এমনিভাবে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা এই মহান অনুগ্রহের অধিকারী হন। তারা ঈমানের ছায়ায় আনন্দঘন ও পরিতৃপ্ত জীবন লাভ করেন। তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা এবং দীর্ঘ জীবনের উৎস হলো এই ঈমান, যা তাদের অজান্তেই তাদের হৃদয়ে বপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনেকে যন্ত্রণা, দ্বিধা, ভয়, আতঙ্ক ও অনুভূতি শক্তির স্বল্পতার মধ্যে জীবন কাটায়; অথচ তারা এর মূল কারণ জানে না। সেটা হচ্ছে তারা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলধন ঈমান হারিয়েছে। জেনে রাখুন! তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান।[৭]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রথম প্রভাব হলো এটি নৈতিকতার ভিত্তি। কারণ নৈতিকতার শৃঙ্খল যেমন— তাক্বওয়া, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ত্যাগ, আন্তরিকতা ইত্যাদি আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কারণ এগুলোর কোনোটিই স্বগোত্রীয় আদর্শের বিপরীত নয়।

দ্বিতীয় বিষয়- আন্তরিকতা ও মানবিক ঐক্য এবং ব্যক্তি ও সামাজিক বিশ্বাসের উপর এর প্রভাব:

মানুষের নিয়্যত ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতা ততটুকু হয়, যতটুকু সে তার নিজ সত্তা ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিয়্যতের একনিষ্ঠতা উক্ত পরিমাণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ঐ ব্যক্তি ধন্য যার আমল, জ্ঞান, ভালোবাসা ও বিদ্বেষ আল্লাহর পরিশুদ্ধ করেছেন এবং তার গ্রহণ, বর্জন, বক্তব্য, নীরবতা, কাজ ও কথাকে একনিষ্ঠ করেছেন’।[৮] তিনি আরও বলেছেন, ‘আমল পরিশুদ্ধ করা আমল করার চেয়ে অনেক কঠিন আর ধ্বংসের হাত থেকে ঈমান রক্ষা করা দীর্ঘকাল ইবাদতে ব্যস্ত থাকার চেয়ে অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়’।[৯] এটা লক্ষণীয় যে, সাধারণভাবে যুবসমাজ তাদের কর্মের ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। সত্যকে মান্য করার ইচ্ছা থাকলেও জৈবিক চাহিদার প্রবল প্রভাবের কারণে তারা কখনো কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে এটি কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়। কারণ একজন যুবক যখন সমাজে পথ চলা শুরু করে, তখন সে ভালো কাজের চর্চার মাধ্যমে তার নিয়্যতকে অপবিত্রতার কলুষতা থেকে পরিষ্কার করে। মানুষ যখন আত্মশুদ্ধির উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার আত্মা কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা লাভ করে। এটি কোনো গোপন বিষয় নয় যে, কাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণতার দিকে মানুষকে অগ্রসর করতে উৎসাহ প্রদান কিংবা ভয় দেখানোর ইতিবাচক প্রভাব বিজ্ঞানীরা অবগত হয়েছেন। শিক্ষা এই ইঙ্গিত দেয় যে, উৎসাহ প্রদানের প্রভাব শিক্ষার উপর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সর্বোত্তম। আল-কুরআনের বহু আয়াতে পাপকর্মের ব্যাপারে সতর্ক এবং ভালো কাজের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে সৎকর্ম ও অর্পিত দায়িত্ব পালনের ছওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কর্তব্য পালনে অবহেলাকারী বা ত্রুটিকারীর শাস্তি দ্বিগুণ করা হয়নি। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ‘যে সৎ কর্ম করবে, সে ১০ গুণ বেশি নেকী পাবে এবং যে মন্দ কাজ করবে, তাকে তার সমপরিমাণ ছাড়া কোনো অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না আর তাদের প্রতি কোনো যুলম করা হবে না’ *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*। আলী রাহিমাহুল্লাহ মালিক আল-আশতার রাহিমাহুল্লাহ-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, ‘তারা আশায় ব্যর্থ; কিন্তু ভালো কাজে তাদের প্রশংসা অব্যাহত ছিল আর তাদের মধ্যে যারা দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিল তাদের শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়নি। কারণ তাদের নেক আমলের অধিক স্মরণ সাহসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং শাস্তি ভোগকারীকে অনুপ্রাণিত করে’।[১০]

---

৬. মুহাম্মাদ হুসাইন আত্বাত্ববাই, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১৯/২৬৮।

৭. শহীদ মুর্তজা আল-মাতহারী, ধর্মীয় ও সামাজিক ভাষণ, পৃ. ২৭৩।

৮. শয়খ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে শু‘বা, তাহুফফুল উকূল আন আলির রাসূল, পৃ. ১০০।

৯. বাহরুল আনওয়ার, ৭৭/২৮৮।

১০. মুহাম্মাদ আব্দুহু, নাহজুল বালাগা, ৩/৬০৯।

কুরআন মাজীদে মানুষের সুখময় জীবন লাভের পথ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আলোচনা করেছেন, যাতে তাদেরকে মহৎ নৈতিকতা অর্জন, সৎকর্ম সম্পাদন, প্রতিকূলতায় ধৈর্যধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা যায়। একবার আল্লাহ বলেছেন, – ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ - جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ‘আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, তারাই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত আর তারা তাতে চিরস্থায়ী থাকবে’ *(আল-বাইয়িনাহ, ৯৮/৭-৮)*। আবার কখনো অন্য সূরায় তিনি বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ ‘হে মানুষ! তুমি তোমার পালনকর্তার জন্য পরিশ্রম করেছ। অতএব, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করো’ *(আল-ইনশিক্বাক, ৮৪/৬)*। আর অন্যটি মানুষকে নেক আমলের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘আর ভালো কাজ করো, নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*। অথবা তিনি তাদেরকে কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং সৎকর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন, – ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ ‘যারা তাদের প্রিয় বস্তু দান করে আর তাদের অন্তর ভীত-শঙ্কিত থাকে এ জন্য যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। আর তারাই কল্যাণের কাজে দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং তাতে তারা অগ্রগামী’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৬০-৬১)*। কেননা কল্যাণের এই প্রতিযোগিতা ঈমানের অন্যতম নিদর্শন এবং কখনো কখনো মহান আল্লাহ মুজাহিদদেরকে তাদের কাজে উৎসাহিত করার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ‘আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট’ *(আল-বাইয়িনাহ, ৯৮/৮)*। আর তিনি নিজেকে দাতা ও মুত্তাক্বীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী উল্লেখ করে বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বী এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের সাথে আছেন’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৮)*। পরিপূর্ণতা ও কল্যাণের পথে পৌঁছার জন্য তিনি ঈমানদারদের উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেন। এর পাশাপাশি তিনি মুশরিক ও নাস্তিকদের সতর্ক করেন এবং কাফের ও পাপাচারীদের অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান কামনা করে তাদেরকে তাঁর ক্রোধের কথা জানিয়ে দেন। এমন অবস্থা সম্পর্কে বুঝানোর জন্য প্রথমত মহান আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর বাণী পেশ করে অবাধ্যদের সম্মুখে ঘোষণা করেন, ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ ‘আপনি এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যদি কাফের হয়ে যান, তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিত্তশালী, প্রশংসিত’ *(ইবরাহীম, ১৪/৮)*।

দ্বিতীয় শর্ত হলো ব্যক্তি ও জাতির ঈমানের ওপর আন্তরিকতার প্রভাব:

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বরকতময় পুনর্জাগরণের সূচনায় এর ভূমিকা সুস্পষ্ট। কারণ জাতির দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং কুরআনের সকল সূরায় বর্ণিত আন্তরিকতার মর্মার্থের প্রভাবকে ইচ্ছার স্বাধীনতা, মানব ব্যক্তিত্ব গঠন ও তার প্রস্তুতির প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের যেকোনো নবজাগরণের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হচ্ছে এর লোক ও নেতাদের বস্তুবাদ থেকে দূরে রাখা এবং নৈতিকতা ও নৈতিক চেতনার প্রতি তাদের আনুগত্য ধরে রাখা, যাতে তারা একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর বীরদর্পে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ইচ্ছার স্তরে কুরআন মানুষের ইচ্ছাকে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেছে। তাই কুরআনের শিক্ষার ফলে একজন মুসলিম তার প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে এবং বিভিন্ন কল্পনার প্রলোভন ও প্রবৃত্তির রঙিন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ - قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

‘মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তান, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্যভাণ্ডার, চিহ্নযুক্ত অশ্ব, গৃহপালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্র; এসব পার্থিব জীবনের সম্পদ আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বলুন! আমি কি তোমাদেরকে এসব হতেও অতি উত্তম কোনো কিছুর সংবাদ দেব? যারা মুত্তাক্বী তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন বাগান রয়েছে, যার নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা তাতে চিরকাল থাকবে আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি, বস্তুত আল্লাহ বান্দাগণের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা’ *(আলে ইমরান, ৩/১৪-১৫)*।

এই শিক্ষা ও বশ্যতার অন্যান্য মডেলের মাধ্যমে কুরআন মানুষকে তার অভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা তার হৃদয়ে মিশ্রিত রয়েছে; যাতে মানুষের ইচ্ছা কামনার হাতিয়ারে পরিণত না হয়। এমন কোনো চালিকাশক্তি নেই, যা মানুষের ইচ্ছাকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থসহ পূর্ণ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে তার অভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করার এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন ‘জিহাদ আল-আকবার’।[১১]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১১. সৈয়দ মুহাম্মাদ বাক্বির আল-হাকীম, উলুমুল কুরআন, পৃ. ৬৯।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৩)

মুরদানের সাথে কোলাকুলি করা ও তাকে চুমু খাওয়ার বিধান: সম্মানিত পাঠক! আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে তাকানোর চেয়ে তার সাথে নির্জনে যাওয়া বা থাকা বেশি মারাত্মক এবং এদুটোর চেয়ে মারাত্মক হচ্ছে তাকে চুমু খাওয়া। আর তাদের দিকে তাকানো বা তাদের সাথে নির্জনে অবস্থানের ব্যাপারেই যদি বিশেষ সতর্কবার্তা থাকে, তাহলে তাদেরকে চুমু খাওয়া কতটা মারাত্মক হতে পারে, একটু ভাবুন। তবে যে বিষয়টি এখানেও লক্ষণীয়, সেটি হচ্ছে কামভাব থাকা বা না থাকা। অনুরূপভাবে দাড়িবিহীন সেই কিশোর-যুবক সুদর্শন নাকি সুদর্শন নয়, সে বিষয়টিও এখানে লক্ষণীয়। তদুপরি শরীরের কোন অঙ্গে চুমু খাওয়া হচ্ছে— মুখে নাকি অন্য কোথাও সেটাও কিন্তু খেয়াল করতে হবে। কারণ এসব দিক বিবেচনায় চুমু খাওয়ার হুকুম বিভিন্ন রকম হতে পারে। নিচের আলোচনা থেকে এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الصَّبِيُّ الْأَمْرَدُ الْمَلِيحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَلَا يَجُوزُ تَقْبِيلُهُ عَلَى وَجْهِ اللَّذَّةِ؛ بَلْ لَا يُقَبِّلُهُ إِلَّا مَنْ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ: كَالْأَبِ؛ وَالْإِخْوَةِ. وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ؛ بَلْ يَحْرُمُ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ النَّظَرُ إِلَيْهِ عِنْدَ خَوْفِ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ لِحَاجَةٍ بِلَا رِيبَةٍ مِثْلَ مُعَامَلَتِهِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ لِلْحَاجَةِ.

وَأَمَّا "مُضَاجَعَتُهُ": فَهَذَا أَفْحَشُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: {مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ} إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ وَلَمْ يَحْتَلِمُوا بَعْدُ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ.

'একজন সুদর্শন, দাড়িহীন বালক অনেক দিক থেকেই একজন বেগানা মহিলার মতো এবং স্বাদ গ্রহণের জন্য তাকে চুম্বন করা জায়েয নয়। বরং তার ব্যাপারে যারা বিশ্বস্ত, কেবল তারাই তাকে চুম্বন করতে পারেন। যেমন- বাবা, সহোদর ভাই। সকলের ঐকমত্য অনুসারে, ঐ একই উদ্দেশ্যে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়াও জায়েয নয়। বরং তাদের অধিকাংশের মতে, যদি সেই আশঙ্কা থাকে, তবে তার দিকে তাকানো হারাম। তার দিকে কেবল প্রয়োজন পড়লে এবং সংশয়মুক্ত হলে তাকানো যাবে। যেমন- তার সাথে লেনদেনের সময়, সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ইত্যাদি। ঠিক যেমনটা প্রয়োজন পড়লে নারীদের দিকে তাকানো যায়। আর তার সাথে শোয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করাই ভালো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাদেরকে সাত বছর বয়সে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং এর জন্য দশ বছর বয়সে তাদেরকে প্রহার করো। আর এসময় তাদের বিছানায় আলাদা করে দাও'। যখন তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করেছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তখন যদি তাদের বিছানা আলাদা করে দিতে হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় হলে কী হতে পারে?![১]

কুয়েতী ফিক্বহ বিষয়ক বিশ্বকোষে এসেছে,

الْأَمْرَدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَبِيحَ الْوَجْهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي جَوَازِ تَقْبِيلِهِ لِلْوَدَاعِ وَالشَّفَقَةِ دُونَ الشَّهْوَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ صَبِيحَ الْوَجْهِ يُشْتَهَى فَيَأْخُذُ حُكْمَ النِّسَاءِ وَإِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ، فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ، وَتَقْبِيلُهُ، وَمُعَانَقَتُهُ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ.

'যদি দাড়িবিহীন ছেলে সুদর্শন না হয়, তাহলে বিদায় দেওয়া ও তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাকে চুমু দেওয়া বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে তার হুকুম পুরুষদের মতোই। তবে, যদি সে সুদর্শন হয়, যাকে দেখে সাধারণত কামভাব জাগতে পারে, তাহলে সে নারীদের হুকুম গ্রহণ করবে— যদিও তারা একই লিঙ্গের হয়। সেজন্য অধিকাংশ ফক্বীহের মতে, আত্মতৃপ্তি লাভের আশায় তার সাথে মুছাফাহা করা, তাকে চুম্বন করা এবং তার সাথে কোলাকুলি করা হারাম'।[২]

একই বিশ্বকোষে আরো এসেছে,

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَقْبِيلُ فَمِ الرَّجُلِ أَوْ يَدِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَكَذَا تَقْبِيلُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَالْمُعَانَقَةُ وَمُمَاسَّةُ الْأَبْدَانِ، وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

'কামভাবসহ কোনো পুরুষের জন্য কোনো পুরুষের মুখ, হাত বা অন্য কোনো অঙ্গে চুমু খাওয়া যেমন জায়েয নেই, তেমনি কোনো নারীর জন্য কোনো নারীকে চুমু খাওয়া, কোলাকুলি করা, শরীর স্পর্শ করা ইত্যাদিও জায়েয নেই। আর এ ব্যাপারে ফক্বীহগণের মধ্যে দ্বিমত নেই'।[৩]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কামভাব বা স্বাদ লাভের আশায় পরস্পর কোলাকুলি করা ও স্পর্শ করা যাবে না। তবে বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কোলাকুলি করা যাবে।

ইমাম বাগাবী রাহিমাহুল্লাহ আলিঙ্গন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, فَأَمَّا الْمَأْذُونُ فِيهِ، فَعِنْدَ التَّوْدِيعِ، وَعِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ وَطُولِ الْعَهْدِ بِالصَّاحِبِ، وَشِدَّةِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ 'কাউকে বিদায় দেওয়ার সময়,

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ৩২/২৪৭-২৪৮।
২. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ১৩/১৩২।
৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ১৩/১৩০।

সফর থেকে কারো আগমনের সময়, লম্বা সময় বিরতির পর বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময় এবং আল্লাহর জন্য গভীর ভালোবাসার ক্ষেত্রে আলিঙ্গন করা অনুমোদিত'।[৪]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا 'নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীগণ যখন পরস্পর সাক্ষাত করতেন, তখন তারা মুছাফাহা করতেন। আর যখন তারা সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করতেন'।[৫]

অনুরূপভাবে আরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চুমু খাওয়া যাবে না। **তবে একটা প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে চুমু খাওয়া জায়েয— এমন কি কোনো ক্ষেত্র নেই? অনুরূপভাবে পরস্পর কোলাকুলি ক্ষেত্রগুলো কী কী?**

চুমু খাওয়া জায়েয ক্ষেত্র অবশ্যই আছে। যেমন-

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কারণ তাদের মধ্যে সহবাস যদি বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে চুমু তো ব্যাপারই না। বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক শুধু নয়, নেকীর কাজও বটে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রীগণকে চুমু খেতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ 'নবী তাঁর কোনো একজন স্ত্রীকে চুমু খেলেন। অতঃপর মসজিদে গেলেন, কিন্তু ওযু করলেন না'।[৬] স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর এসব সম্পর্কের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে।

২. আল্লাহভীরু আলেম, ন্যায়পরায়ণ শাসক, মাতা-পিতা, শিক্ষক এবং সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য— এমন প্রত্যেকের হাতে যেমন চুমু খাওয়া জায়েয, তেমনি তাঁদের মাথা, কপাল ও দুই চোখের মাঝখানেও চুমু খাওয়া জায়েয। তবে এসবগুলো হবে সদ্ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য বা সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় স্নেহপরবশ হয়ে অথবা দ্বীন পালন হিসেবে। আর তা হবে কামভাব না আসার ব্যাপারে নিরাপদ হওয়ার শর্তে।[৭] ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ 'অতঃপর আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলাম, অতঃপর তাঁর হাতে চুমু খেলাম'।[৮]

৩. সন্তানকে চুমু খাওয়া জায়েয শুধু নয়, বরং সুন্নাত। মা-বাবা সন্তানের প্রতি ভালোবাসাসিক্ত হয়ে মাথা, কপাল ও গালে চুমু দেবেন— এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার হাসান ইবনু আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় তার নিকট আক্বরা ইবনু হাবিস তামীমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বসা ছিলেন। আক্বরা ইবনু হাবিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমার ১০ জন সন্তান আছে, কিন্তু আমি তাদের কাউকেই কোনো দিন চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[৯]

৪. শর্তসাপেক্ষে অন্যান্য মাহরামকে চুমু দেওয়া যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

(ক) হৃদ্যতা, অনুগ্রহ এবং স্নেহের বশবর্তী হয়ে চুমু হতে হবে; রসিকতা বা খেলা হিসেবে হওয়া উচিত নয়; কামভাবের সাথে চুম্বন করার তো প্রশ্নই আসে না।

(খ) চুম্বন চেহারায় হতে হবে, তবে কপালে হলে আরো ভালো হয়, তার চেয়ে ভালো হয় মাথায় চুমু খেলে। মুখে চুমু খাওয়া জায়েয নেই।

(গ) ফেতনার ঝুঁকিমুক্ত হতে হবে। অতএব, যদি কোনো যুবক আশঙ্কা করে যে, তার চুম্বন তার মাঝে বা তার মাহরাম নারীর মাঝে প্রভাব ফেলবে, অথবা মাহরাম মেয়েটি যদি যুবকটির খারাপ চরিত্র বা ধর্মের অভাবের কারণে তার থেকে নিরাপদ বোধ না করে, তাহলে সেক্ষেত্রে চুম্বন জায়েয নেই।

(ঘ) তাদের মধ্যকার মাহরাম হওয়ার সম্পর্ক হতে হবে বংশসম্পর্কীয় মাহরাম। যেমন- মা, মেয়ে, বোন। দুধ সম্পর্কীয় ও বিয়ে সম্পর্কীয় মাহরামকে চুমু না দেওয়াই ভালো। যেমন- ছেলের বউ, স্ত্রীর মা, স্ত্রীর (অন্য পক্ষের) মেয়ে। কারণ এই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কামভাব উদ্রেকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল।

এই শর্তগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এসব শর্ত পূরণ করা হলে মাহরাম ব্যক্তিদের চুমু দেওয়া যায়।[১০] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যখন তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসতেন, তিনি তার দিকে এগিয়ে যেতেন, এরপর তাকে চুম্বন করতেন এবং তাকে তার আসনে বসাতেন। আর যখনই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে আসতেন, তিনি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াতেন, এরপর তাকে চুম্বন করতেন এবং তাকে তার আসনে বসাতেন।[১১]

বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে তার পরিবারের কাছে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করেই দেখলাম তার মেয়ে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় শুয়ে আছেন। আমি তার বাবাকে দেখলাম, তিনি তার গালে চুমু খেয়ে বললেন, মেয়ে! তুমি কেমন আছো?[১২]

ইবনু মুফলিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু মানছূর (রহিমাহুল্লাহ) আবূ আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন, একজন পুরুষ কি তার মাহরাম নারীকে চুম্বন করতে পারে? তিনি

৪. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, ১২/২৯৩।
৫. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৯৭, 'হাসান'।
৬. সুনানে তিরমিযী, হা/৮৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৫০২, 'ছহীহ'।
৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ১৩/১৩১।
৮. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/২২৬, 'ছহীহ'।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩১৮।
১০. islamqa.info-এর এই লিংক থেকে গৃহীত: https://islamqa.info/ar/answers/114193/
১১. সুনানে তিরমিযী, হা/৩৮৭২, 'ছহীহ'।
১২. সুনানে তিরমিযী, হা/৩৮৭২, 'ছহীহ'।

বললেন, যদি সে সফর থেকে আসে এবং নিজের জন্য (ফেতনার) ভয় না পায়, তাহলে চুম্বন করতে পারে। তবে কখনই মুখে চুমু দেবে না; বরং কপাল বা মাথায় চুমু দেবে।[১৩] এখানে ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো জন্য পরস্পর মুখে চুমু খাওয়া যাবে না।

ছোট মেয়েদের দিকে তাকানো ও চুমু খাওয়ার বিধান কী?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মুরদান তথা দাড়িবিহীন কিশোর ও যুবকদের দিকে তাকানো, তাদের সাথে নির্জনে যাওয়া, তাদেরকে চুমু খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরেছি। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, তা হচ্ছে— তাহলে ছোট মেয়েদের দিকে তাকানো, তাদেরকে স্পর্শ করা, কোলে নেওয়া, চুমু খাওয়া ইত্যাদিও কি চলবে না?

সর্বসম্মতিক্রমে কামভাব ও স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছোট মেয়ের দিকে তাকানো, তাকে চুমু খাওয়া ইত্যাদি হারাম।[১৪]

ইবনু কুদামা বলেন, قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ فِي رَجُلٍ يَأْخُذُ الصَّغِيرَةَ فَيَضَعُهَا فِي حِجْرِهِ، وَيُقَبِّلُهَا: فَإِنْ كَانَ يَجِدُ شَهْوَةً فَلَا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فَلَا بَأْسَ 'একজন পুরুষ একটি ছোট মেয়েকে তার কোলে নিলে এবং তাকে চুম্বন করলে বিধান কী হবে? সে ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বলেন, যদি সে কামনা অনুভব করে, তাহলে এভাবে কোলে নিতে ও চুমু দিতে পারবে না। কিন্তু যদি তা কামনার জন্য না হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই'।[১৫]

তবে যদি কামভাবের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে তাদের দিকে তাকানো বা তাদের সাথে মুছাফাহা করা যাবে কিনা?

এক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে, মেয়ে যদি এমন বয়সে উপনীত হয়, যে বয়সে তার দিকে তাকালে বা স্পর্শ করলে বা চুমু খেলে কামভাব জাগতে পারে, তাহলে তাদের সাথে একাজগুলো করা যাবে না— যদিও তারা এখনও প্রাপ্ত বয়স্কা হয়নি। রমলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الأَصَحُّ حِلُّ النَّظَرِ إِلَى صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَظَنَّةٍ لِلشَّهْوَةِ لِجَرَيَانِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ 'সঠিক কথা হলো, এমন অল্পবয়সী মেয়ের দিকে তাকানো জায়েয— যার প্রতি সাধারণত কামভাব জাগে না। কারণ বিভিন্ন যুগ ও দেশে মানুষের স্বাভাবিক প্রচলন অনুযায়ী এমন মেয়ে সাধারণত কামনা জাগ্রত হওয়ার জায়গা নয়'।[১৬]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, إِذَا بَلَغَتِ الْبِنْتُ حَدًّا تَتَعَلَّقُ بِهَا نُفُوسُ الرِّجَالِ وَشَهَوَاتُهُمْ فَإِنَّهَا تَحْتَجِبُ دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ وَالشَّرِّ، وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِاخْتِلَافِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ مِنْهُنَّ مَنْ تَكُونُ سَرِيعَةَ النُّمُوِّ جَيِّدَةَ الشَّبَابِ، وَمِنْهُنَّ مَنْ تَكُونُ بِالْعَكْسِ. 'যখন মেয়ে এমন এক বয়সে উপনীত হয়, যে সময় পুরুষদের মন ও আকাঙ্ক্ষা তার সাথে যুক্ত হতে পারে, তখন ফেতনা ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে তাকে পর্দা করতে হবে। এটি বিভিন্ন মেয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্রুত বড় হয় ও তরুণী হয়, আবার কেউ কেউ হয় এর উল্টো'।[১৭]

কুয়েতী ফিক্বহ বিষয়ক বিশ্বকোষে এসেছে,

وَاتَّفَقُوا –أَيِ الْفُقَهَاءُ- عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ سِوَى الْفَرْجِ مِنْهَا.

'তারা– অর্থাৎ ফক্বীহগণ- একমত যে, একজন পুরুষের জন্য কামভাব ছাড়া এমন ছোট বালিকার পুরো শরীরের দিকে তাকানো জায়েয, যাকে দেখে কামভাব হতে পারে এমন বয়স পর্যন্ত সে পৌঁছেনি। তবে তার যোনির দিকে তাকানো যাবে না'।[১৮]

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে— যে বয়সী মেয়েকে দেখে সাধারণত কামভাব জাগ্রত হতে পারে— একথার অর্থ হলো, ভালো মানুষের ভেতর কামভাব জাগ্রত হতে পারে। কারণ খারাপ মানুষের যে কোনো কিছু দেখে কামভাব জাগতে পারে। সুতরাং তার বিষয়টি এখানে বিবেচ্য নয়।

কামভাব উদ্রেক হওয়ার সেই বয়স নিয়ে ফক্বীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আল-ফাওয়াকেহ আদ-দাওয়ানীতে এসেছে, (وَاخْتُلِفَ فِيهَا) أَيْ الصَّبِيَّةِ (إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى) كَبِنْتِ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ 'ছোট বালিকা কামভাবের বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন- চার বা পাঁচ বছরের মেয়ে'।[১৯] আবার মালেকী মাযহাব মতে, কোনো মেয়ে তিন বা চার বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে স্পর্শ করা যাবে না, তবে তার দিকে তাকানো যাবে।[২০]

সেজন্য, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, এর কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। বরং সাধারণত কামভাবের উদ্রেক হয় কিনা সেটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুরূপভাবে ছোট বালিকাকে চুমু খাওয়াও জায়েয হবে না— যদি তৃপ্তি লাভের বাসনা জাগ্রত হয়। ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَتَقْبِيلُ الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَهَا مِنَ الْعُمْرِ ثَلَاثُ سِنِينَ جَائِزٌ إِذْ لَا شَهْوَةَ تَقَعُ هُنَاكَ فِي الْأَغْلَبِ فَإِنْ وُجِدَ شَهْوَةٌ حُرِّمَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْخَلْوَةُ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنْ خِيفَ مِنْ ذَلِكَ حُرِّمَ فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ.

'তিন বছর বয়সী মেয়েকে চুম্বন করা জায়েয, কারণ সেখানে সাধারণত কোনো কামভাব জাগে না। তবে যদি কামভাব থাকে, তাহলে তা হারাম হবে। মাহরামদের সাথে নির্জনে থাকার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি সেই আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা হারাম হবে। এই সূত্রটির ব্যাপারে চিন্তা করুন'।[২১]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১৩. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাব আশ-শার'ইয়্যাহ, ২/২৬৬।
১৪. দ্রষ্টব্য: আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ১৩/১৩০; https://islamqa.info/ar/answers/110354/
১৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ৭/১০৩।
১৬. শামসুদ্দীন আর-রমলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, ৬/১৮৯।
১৭. মুহাম্মাদ আল-উছাইমীন, মাজমূ'আতু আসইলাতিন তাহুম্মুল উসরাহ আল-মুসলিমাহ, পৃ. ৪৩-৪৪।
১৮. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ৪০/৩৪৭।
১৯. নাফরাবী, আল-ফাওয়াকেহ আদ-দাওয়ানী আলা রিসালাতি ইবনি আবী যায়েদ আল-ক্বায়রাওয়ানী, ১/৩০১।
২০. এই লিংকে তথ্যটি পাবেন: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26186/
২১. তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১৯৯।

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-৪র্থ পর্ব)

باب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ.

পরিচ্ছেদ: ৩/৩. কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আওয়াজকে উঁচু করবেন:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا - وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ - وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

৬০. ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবুন নু'মান আরেম ইবনে ফাযল হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবূ আওয়ানা হাদীছ শুনিয়েছেন, তিনি আবূ বিশর থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনে মাহাক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে, তিনি বলেন, 'এক সফরে আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে থেকে আসছিলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছালেন। তখন ছালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ওযূ করছিলাম। আমরা (তাড়াহুড়ো করে) আমাদের পায়ে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলাম (ভালোমতো ধুচ্ছিলাম না)। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'দুঃখ (বা ধ্বংস) হোক! সেই গোড়ালিগুলো জাহান্নামের আগুনে!' তিনি এটি দুই বা তিনবার বললেন।

তাখরীজ: ইমাম বুখারী[১] হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল আত-তাবুযাকী ও আবুন নু'মান আরেম ইবনে ফাযল থেকে। ইমাম মুসলিম[২] হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ফুযাইল ইবনে হুসাইন আল-জাহদারী ও শায়বান ইবনে ফাররুখ থেকে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল[৩] হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আফফান ইবনে মুসলিম আছ-ছফফার থেকে। ইমাম নাসাঈ[৪] হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবুল ওয়ালীদ আত্ব-ত্বয়ালিসীর সূত্রে।

তারা সকলেই (মুসাদ্দাদ, মূসা, আবুন নু'মান, ফুযাইল, শায়বান, আফফান ও আবুল ওয়ালীদ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবূ আওয়ানা থেকে, তিনি আবূ বিশর থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনে মাহাক থেকে।

হাদীছটি আরও বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ দাঊদ[৫] মুসাদ্দান ইবনে মুসারহাদ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া আল-কাত্তান থেকে। ইমাম মুসলিম[৬] ও ইবনু মাজাহ[৭] আবূ বকর ইবনু আবী শায়বা থেকে। আবূ বকর ইবনু আবী শায়বা[৮] ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল[৯] হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ থেকে। ইমাম নাসাঈ[১০] ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল[১১] হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে।

তারা সকলেই (আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী, ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান আছ-ছাওরী থেকে।

ইমাম মুসলিম[১২] ও নাসাঈ[১৩] হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ আয-যব্বী থেকে। ইমাম মুসলিম[১৪] ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল[১৫] হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-ওয়াসিত্বী থেকে।

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০, ৯৬, ১৬৩।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪১।
৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৭০০২, ৬৯২৭, ৬৬৩৯, ৭২২৪, ৭০৯৬, ৭০৩০।
৪. নাসাঈ, হা/১১১, ১৪২।
৫. আবূ দাঊদ, হা/৯৭।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪১।
৭. ইবনু মাজাহ, হা/৪৫০।
৮. ইবনু আবী শায়বা, হা/২৭০।
৯. মুসনাদে আহমাদ, হা/৭০০২, ৬৯২৭, ৬৬৩৯, ৭২২৪, ৭০৯৬, ৭০৩০।
১০. নাসাঈ, হা/১১১, ১৪২।
১১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৭০০২, ৬৯২৭, ৬৬৩৯, ৭২২৪, ৭০৯৬, ৭০৩০।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪১।
১৩. নাসাঈ, হা/১১১, ১৪২।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪১।
১৫. মুসনাদে আহমাদ, হা/৭০০২, ৬৯২৭, ৬৬৩৯, ৭২২৪, ৭০৯৬, ৭০৩০।

তারা সকলেই (সুফিয়ান ছাওরী, জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ আয-যব্বী ও শু‘বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-ওয়াসিত্বী) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মানছূর ইবনুল মু‘তামির থেকে, তিনি হেলাল ইবনে ইয়াসাফ থেকে, তিনি মুসাদ্দাদ থেকে।

তারা দুইজন (ইউসুফ ইবনে মাহাক ও মুসাদ্দাদ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে।

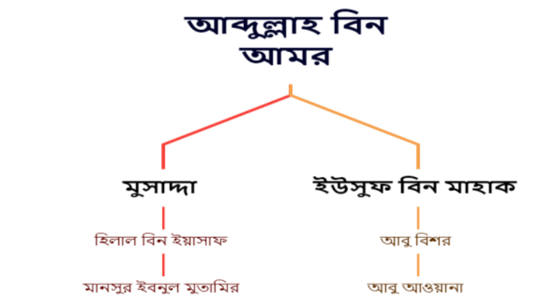

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) আবুন নু‘মান: আরেম তার উপাধি। এই রাবীর বিস্তারিত বিবরণ ‘কিতাবুল ঈমান-এ চলে গেছে।

(২) আবূ আওয়ানা: ওয়াযযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ইয়াশকুরী। তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

(৩) আবূ বিশর: জা‘ফর ইবনু ইয়াস। ছহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয়েই তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। প্রায় সকল মুহাদ্দিছ তাকে মযবূত বলেছেন। একমাত্র শু‘বা তার মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হাদীছগুলোকে দুর্বল বলতেন। কেননা তিনি মুজাহিদ থেকে সরাসরি শুনেননি।[১৬] আর আমাদের আলোচিত হাদীছটি আবূ বিশর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেননি। সুতরাং আলোচিত হাদীছ বিশুদ্ধ।

(৪) ইউসুফ ইবনে মাহাক: মাহাক শব্দটি কেউ কেউ মাহিকও পড়েছেন। তথা ‘হা’ বর্ণে যবর ও যের উভয় দিয়েই পড়া যায়। এই শব্দটি গায়রে মুনছারিফ কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা এই শব্দকে গায়রে মুনছারিফ মনে করেন তাদের দলীল হচ্ছে, শব্দটি অনারবী এবং নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ইবরাহীম। তথা গায়রে মুনছারিফ-এর দুটি সাবাব বা কারণ আ‘জাম এবং আ‘লাম এই শব্দের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। ‘মাহাক’ শব্দটি ফার্সী ‘মাহ’ শব্দ থেকে এসেছে। ‘মাহ’ শব্দের অর্থ চাঁদ। শেষের কাফটি তাছগীরের জন্য যুক্ত করা হয়েছে তথা ছোট চাঁদ।

যাদের মতে শব্দটি মুনছারিফ তারা মাহাক শব্দকে ছিফাত হিসেবে গণ্য করেন; নাম হিসেবে নয়। ছোট চাঁদের মতো সুন্দর কিছুর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটি ছিফাত হিসেবে গণ্য হলে আলামিয়্যাতের সাবাব বাতিল হয়ে যায়। ফলত শব্দটি মুনছারিফ হিসেবে গণ্য হয়।[১৭]

তাদের আরও একটি দলীল হচ্ছে, ‘হা’ বর্ণে যের দিয়ে পড়লে শব্দটি আর অনারব থাকে না বরং مهكت الشَّيْءَ أمهكه مهكًا পূর্ণ আরবী শব্দের ইসমে ফায়েল-এর ছীগাহ হিসেবে গণ্য হবে। তখন অর্থ হবে দুর্বল করা বা ক্ষয় করা।

ইউসুফ ইবনে মাহাককে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও ইমাম নাসাঈ-সহ অনেকেই মযবূত বলেছেন।[১৮]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আছ: একজন সম্মানিত ছাহাবী। ‘কিতাবুল ঈমান-এ তার বিবরণ চলে গেছে।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১৬. আল-জারহু ওয়াত তা‘দীল, ২/৪৭৩।
১৭. বিস্তারিত: ক্বাসত্বলানী, ইরশাদুস সারী, ১/২২।
১৮. তাহযীবুত তাহযীব, ৪/৪৫৯।

কুরবানীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: গুরুত্ব ও মর্যাদা

*-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ**

যিলহজ্জ মাস হলো হিজরী সনের দ্বাদশ মাস এবং সর্বশেষ মাস। এ মাসেই রয়েছে বিত্তবানদের ওপর ফরয হজ্জ এবং মানব ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ঘটনা তথা আপন সন্তানকে কুরবানী করার ইতিহাস।

কুরবানীকে আরবী ভাষায় ‘উযহিয়্যাহ’ বলা হয়। এর অর্থ হলো ওই পশু, যা কুরবানীর দিন যবেহ করা হয়। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশু যবেহ করাই কুরবানী। ঈদুল আযহা মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। দেখতে দেখতেই কুরবানীর ঈদ আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। ইসলামে কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা তাকিদপূর্ণ সুন্নাহ। উট, গরু, মহিষ, দুম্বা, ভেড়া ও ছাগল দ্বারা কুরবানী করতে হবে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার কমপক্ষে এক বছর পূর্ণ হতে হবে; গরু-মহিষের দুই বছর পূর্ণ হতে হবে; উটের পাঁচ বছর পূর্ণ হতে হবে।[১] এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন- হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই। তদ্রূপ হাঁস-মুরগি বা কোনো পাখি দ্বারাও কুরবানী জায়েয নেই।[২] যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে পালিত হয় এ উৎসব। কুরবানী শব্দটির অর্থ নৈকট্য অর্জন করা। মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করাই মূলত ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদের তাৎপর্য। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিয়ে অনন্য ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর নির্দেশেই তিনি ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন মক্কার মরু প্রান্তরে। মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে তাঁর কুরবানী কবুল করেন এবং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানী মঞ্জুর করেন। এরই সূত্র ধরে গোটা মুসলিম জাহানে আজও চলে আসছে কুরবানীর এই ধারা। এর ভেতর দিয়ে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিকে অগ্রসর হয় মুসলিম জাতি। কুরবানী মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। পশু কুরবানীর মাধ্যমে গরীব-দুঃখী ও পাড়া-প্রতিবেশীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ ও সম্পদত্যাগই হলো কুরবানী। কুরবানী শুধু একটি আনন্দ-উৎসব নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও দর্শন।

ঈদুল আযহা আত্মত্যাগের প্রেরণায় উজ্জীবিত এক অনন্য আনন্দ উৎসব। যে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ মূর্ত হয় মানুষের জীবনে, তার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হলো এই কুরবানী। পশু কুরবানীর ভেতর দিয়ে মানুষের ভেতরে থাকা পশুশক্তি, কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি রিপুকে ত্যাগ করতে হয়। তাই শুধু পশু নয়, প্রয়োজন পশুত্বের কুরবানী। কুরবানীদাতা শুধু পশুর গলায় ছুরি চালান না; তিনি তার সব কুপ্রবৃত্তির ওপরও ছুরি চালিয়ে তাকে নির্মূল করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ ‘আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছি। আল্লাহ তাদের রূযী হিসেবে যেসব গৃহপালিত পশু দিয়েছেন, তার উপর তারা যেন (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৪)*।

কুরবানীর ঈদ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম)-এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর পশু কুরবানী করে থাকে। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে নির্দেশ দিচ্ছেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ‘অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন’ *(আল-কাউছার, ১০৮/২)*।

কুরবানীর মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জানমাল থেকে শুরু করে সবকিছুই কুরবানী করতে প্রস্তুত—এই জানান দেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পুরো পরিবারের নজিরবিহীন কুরবানীর ইতিহাস মানুষকে যে ত্যাগের শিক্ষা দেয়, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মুমিন তার সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে।

নবী ইবরাহীম, তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম) এবং মা হাজেরার আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলো আল্লাহ তাআলা হজ্জের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে স্বপ্নে দেখালেন, তিনি তাঁর

---

* চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩।

২. আল ফিক্বহুল মুয়াসসার, পৃ. ১৮৯।

পুত্রকে যবেহ করছেন *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০২)*। যেভাবে ‘কুরবানী’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

“এই দিনই ‘মিনা’-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে ‘খুন ক্ষরিয়ে নে’
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি! কেঁপোনা ক্ষুদ্র মন!
আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
ওরে হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন।”

পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গেলে আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ’। প্রশ্ন হলো, তাহলে কেন দুম্বা বা ছাগল যবেহ করলেন? এর উত্তর হলো, যদি সেদিন এই ঘটনা না ঘটত, তাহলে পরবর্তীতে এভাবে মানুষ কুরবানী চলমান থাকত। অতএব, আল্লাহ মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন, মানুষ যবেহ করার জিনিস নয়; যবেহ যদি করতে হয়, তাহলে পশু যবেহ করো।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা একবার অসুস্থ হলে তাঁর দাদা ১০০ উট যবেহ করেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পশু যবেহ করা মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচলন করেননি; বরং পূর্ব থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু যবেহ করা হতো। পশু কুরবানীর আরো একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে মূসা আলাইহিস সালাম-এর জাতিকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন, ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ‘আর স্মরণ করো, যখন মূসা তাঁর ক্বওমকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ করবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/৬৭)*।

গরু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তোমরা এর দুধ পান করতে পার, গোশত খেতে পার এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য উপকার সাধন করতে পার। হাদীছে এসেছে, পশু যবেহ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম। তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিষ্ঠার সাথে কেবল আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায়, তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে ঈমান সহকারে পশু যবেহ করে। এমন কুরবানীকে আরবীতে ‘নুসুক’ বলা হয়েছে, যার আরেকটি অর্থ অনুগত। আসলে আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন, কে কোন উদ্দেশ্যে কুরবানী করছে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। কাজী নজরুল ইসলাম তার ‘শহীদী-ঈদ’ কবিতায় বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন—

‘মনের পশুরে করো জবাই
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।’

আল্লাহর নামে পশু কুরবানী করে তা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মানে দান নয়; তা ত্যাগ। তাই তো কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘শহীদী-ঈদ’ কবিতায় আরও লিখেছেন—

‘চাহি নাকো গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান? ও দান ঝুট।
চাই কোরবানী, চাই না দান।’

আমাদের পুণ্যকর্মগুলোর মূল উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাহলে তিনি হয়তো আমাদের আমল গ্রহণ করবেন। আল্লাহ যাদের সামর্থ্য দিয়েছেন, তারা ইচ্ছা করলে কুরবানী ঈদের বাজেটের একটি অংশ গরীবদের জন্য ব্যয় করতে পারেন। আমরা যদি এই ঈদে সম্মিলিতভাবে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে অনেক পরিবারকে আমরা ঈদ আনন্দে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব। কেননা গরীব-অসহায়দের সাহায্য করাই ইসলামের শিক্ষা আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা ঘরে বসেই তাঁর বান্দাদের কষ্ট দূর করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। যারা তাঁর বান্দার কষ্টের সময় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে নেন। কুরবানীর ফযীলত লিখে সমাপ্ত করা অসম্ভব। তাই সমস্ত মুসলিম জাতির প্রতি আবেদন, যদি আপনাদের কুরবানী করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করে কুরবানী করুন।

পরিশেষে বলতে চাই, কুরবানী হলো ইসলামের এক মহান নিদর্শন। কুরআনের সূরা আল-কাউছারে প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করতে ও কুরবানী করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারেকাছেও না আসে’।[৩] নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً ‘হে লোক সকল! প্রত্যেক পরিবারের ওপর প্রতি বছর কুরবানী দেওয়া অপরিহার্য’।[৪]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন, তাদের সকলকে সাধ্য অনুযায়ী কুরবানী করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩. দারাকুত্বনী, হা/৩৫।
৪. আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮, হাসান।

মুহাররম মাসের তাৎপর্য ও কারবালার ইতিহাস

*-মাহবূবুর রহমান মাদানী**

ভূমিকা:

আরবী চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস হলো মুহাররম মাস। হাদীছে এই মাসকে 'আল্লাহর মাস' বলে সম্মানিত করা হয়েছে আর এই মাসের ছিয়ামকে সর্বোত্তম নফল ছিয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়াম'।[১] আশূরা আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো দশম।

আশূরায়ে মুহাররমে ছিয়াম পালনের তাৎপর্য:

এ দিনে মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথী বানূ ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করেন এবং ফেরাউন ও তার সঙ্গীদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারেন। তাই ইয়াহূদীরাও এই মাসকে সম্মান করত এবং ছিয়াম পালন করত। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন ইয়াহূদীরা আশূরার দিনে ছিয়াম পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ 'এটা কী এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে ছিয়াম রাখছ?' ইয়াহূদীরা বলল, هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ 'এ এক মহান দিন, যাতে আল্লাহ বানূ ইসরাঈলকে তাদের শত্রু (ফেরাউনের কবল) থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে ছিয়াম পালন করেছিলেন'। এ কথা শুনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমরা অধিক হক্বদার ও তাঁর অধিক নিকটবর্তী।' সুতরাং তিনি ঐ দিনে ছিয়াম রাখলেন এবং অন্যকে ছিয়াম রাখার আদেশ দিলেন।[২] সালামা ইবনু আকওয়া রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ 'আশূরার দিন নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, 'যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয়' অথবা বলেছেন, 'সে যেন ছওম রাখে আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়'।[৩]

ইয়াহূদীরা শুধু ১০ মুহাররম ছিয়াম পালন করে। তাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ 'যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই (১০ মুহাররমের সাথে উক্ত মাসের) নবম তারিখেও ছিয়াম রাখব'।[৪]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে আশূরার দিনে ছিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বলেন, أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ 'আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি বিগত এক বছরের গুনাহ মোচন করে দিবেন'।[৫] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ 'আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে আশূরার ছিয়ামের ওপরে অন্য কোনো দিনের ছিয়ামকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস তথা রামাযান মাস (এর ওপর অন্য কোনো মাসকে গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি)'।[৬] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 'আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে আশূরার দিনে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হলো, তখন যার ইচ্ছা ছিয়াম পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না'।[৭]

কারবালার ইতিহাস:

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের ৫০ বছর পরে ৬১ হিজরীর মুহাররম মাসের ১০ তারিখে তাঁর প্রিয়তম নাতি হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ইরাকের কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। এ ঘটনা মুসলিম উম্মতের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তবে মুহাররম মাসের ফযীলতের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৬০ হিজরীতে ইরাকবাসীরা জানতে পারে যে, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ইয়াযীদের হাতে বায়আত করেননি। তাই তারা তার হাতে বায়আত করতে আগ্রহী হয়। এই জন্য

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩; মিশকাত, হা/২০৩৯।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭১৪।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৪।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৬।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২০০১।

তারা তাকে কূফায় আসার জন্য প্রায় ৫০০ চিঠি পাঠায়। বিষয়টি যাচাই করার জন্য তিনি তার চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে কূফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম এসে জানতে পারেন যে, আসলেই তারা হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কেই চাচ্ছে। অতএব, তিনি হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর পক্ষে বায়আত নেওয়া শুরু করেন। এতে ২০ হাজার ইরাকবাসী হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর পক্ষে বায়আত নেয়। অন্য দিকে সিরিয়ায় ইয়াযীদের নিকট উক্ত বায়আত গ্রহণের কথা পৌঁছা মাত্রই তিনি বাছরার গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দেন এবং বলেন, কূফাবাসী যেন হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ না করে। কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, মুসলিম ইবনে আকীলের কিছু সমর্থক উবায়দুল্লাহর প্রাসাদ ঘেরাও করেন। গভর্নর এটা দেখে ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর ভয়ভীতি দেখান। তাই ইয়াযীদের ধরপাকড় ও শাস্তির ভয়ে মুসলিমকে রেখে তারা পলায়ন করে। ফলে উবায়দুল্লাহ মুসলিমকে গ্রেফতার করে হত্যার আদেশ দেয়। কূফাবাসীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে মুসলিম দ্রুত হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দেন যে, হুসাইন! তুমি সবাইকে নিয়ে মদীনায় ফেরত যাও। কারণ তারা বায়আতের ব্যাপারে ওয়াদা রক্ষা করেনি। হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মক্কা হতে কূফার উদ্দেশ্যে ৮ যিলহজ্জ তারিখে রওয়ানা দেন। যাত্রাপথে চিঠি হস্তগত হলে তিনি কূফার পথ পরিহার করে সিরিয়ায় ইয়াযীদের কাছে যাওয়ার জন্য বাসনা করেন। কিন্তু ইয়াযীদের সেনাবাহিনী কারবালার ময়দানে তার গতিরোধ করে। তখন তিনি তাদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন— (১) তাকে ইয়াযীদের নিকট যেতে দেওয়া হোক, যাতে তিনি ইয়াযীদের হাতে বায়আত গ্রহণ করতে পারেন অথবা (২) তাকে মাদীনায় ফিরে যেতে সুযোগ দেওয়া হোক অথবা (৩) তাকে যেকোনো সীমান্তের দিকে যেতে দেওয়া হোক, যাতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বসবাস করতে পারেন। কিন্তু তারা তার কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করল না। পরিশেষে যা হবার তাই হলো। গুটিকয়েক লোক নিয়ে হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে তিনিসহ সবাই কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন। তাকে শহীদ করে ইয়াযীদের সৈন্য শাম্মার ইবনে যুল জাওশান।

শিক্ষা:

(১) কূফাবাসী শীআদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি জানা গেল।
(২) ইয়াযীদ হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে হত্যা করার আদেশ দেননি।
(৩) ইয়াযীদের কয়েকজন সেনাবহিনীই হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর হত্যার জন্য দায়ী।
(৪) হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে হত্যা করা যেমন অন্যায় ছিল; অনুরূপভাবে উমার, উছমান ও আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম-কে হত্যা করাও মর্মান্তিক ছিল কিন্তু তাদের জন্য তো শীআরা ক্রন্দন ও মাতম করে না। কারণ হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর প্রকৃত হত্যাকারী ছিল তারাই। এখন তারা মাতম ও শোক পালন করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে। আল্লাহই অধিক অবগত!

কারবালার ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার পরিণাম: এক শ্রেণির লোক ১০ মুহাররম হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর স্মরণে শোক মিছিল বের করে, মর্সিয়া ও শোকগাঁথা গায়, মাতম করে, বুক চাপড়ায়, ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর নকল কবর তৈরি করে মিছিল বের করে, মাতম করতে করতে শরীরের অংশ বিশেষ কেটে নিজেকে রক্তাক্ত করে। অনেকে ইয়াযীদ, মুআবিয়া, আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম প্রমুখ ছাহাবীকে গালিগালাজ করে, যা ইসলামী শরীআতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ 'যে ব্যক্তি গালে আঘাত করে, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলিয়্যাতের ডাক ডাকে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৮] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা জাহিলিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আলকাতরার কাপড় প্রদান করবেন এবং অগ্নিশিখা দ্বারা নির্মিত বর্ম পরিধান করাবেন'।[৯] তিনি আরও বলেছেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ ব্যয় করলেও তাদের একজনের এক মুষ্টি ও অর্ধ মুষ্টি পরিমাণ পৌঁছতে পারবে না'।[১০]

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাররম মাস অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি মাস। ফযীলতপূর্ণ অনেক ইবাদতের সমারোহ ঘটেছে এই মাসে। আর এই মাসে সংঘটিত কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি। আল্লাহ আমাদের জন্য বিষয়গুলো সহজ করে দিন- আমীন!

---

৮. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৪।
৯. ইবনু মাজাহ, হা/১৫৮১, হাদীছ ছহীহ।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪১।

মুমিনের পরিচয় ও তার গুণাবলি

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা:
ইসলামে একজন মুমিন (সত্যিকার ঈমানদার) কেবল নামমাত্র মুসলিম নয়; বরং সে এমন একজন ব্যক্তি, যে তার বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রতিফলিত করে। একজন মুমিনের পরিচয় শুধু ছালাত, ছিয়াম বা অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার চরিত্র, আচার-আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে মুমিনের গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা একজন সত্যিকারের মুমিনকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।
এই প্রবন্ধে একজন মুমিনের পরিচয় এবং তার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যা তাকে পরিপূর্ণ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

মুমিনের পরিচয়:
মুমিন আরবী শব্দ, যা ঈমান শব্দ থেকে এসেছে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা। আর মুমিন শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাসী, সত্যায়নকারী, ঈমানদার ইত্যাদি। মুমিন শব্দের অর্থ হলো ঈমানদার বা বিশ্বাসী, যে আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির ঈমান আছে তাকে মুমিন বলা হয়।
ইসলামী পরিভাষায় ঈমান হলো, تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ‘অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। এটি আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় আর অবাধ্যতার মাধ্যমে হ্রাস পায়।[১]
শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ ‘ঈমান হলো অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা, মৌখিক স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়ন করা’।[২]

মুমিনের গুণাবলি:
প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সম্মানিত। মুমিনের অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৭)*। মুমিন বান্দারা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মুমিন তো তারাই, যারা ঈমানের ৬টি ভিত্তির প্রতি বিশ্বাস রাখে। ঈমানের ৬টি ভিত্তি হলো— (ক) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, (খ) তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, (গ) তাঁর নাযিলকৃতত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, (ঘ) তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, (৫) ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং (৬) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস।[৩] ‘তাদের জন্য রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(আল-বাযি়্যনাহ, ৯৮/৭-৮)*। প্রত্যেক মুমিনের মাঝে কিছু গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, যাতে সকল মানুষের মধ্য থেকে মুমিনকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

(১) মুমিনরা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ঈমান রাখে: মুমিন দাবিদার ব্যক্তিকে অবশ্যই ৬টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে। ঈমানের ৬টি ভিত্তির কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ ঈমান নষ্ট করে দিবে। তাই সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করে এই ৬টি ভিত্তির প্রতি মযবূত বিশ্বাস রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا﴾ ‘প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করে না’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৫)*।

(২) মুমিনরা ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী: মুমিনের একটি গুণ হলো- তারা ছালাতের ব্যাপারে খুবই মনোযোগী হয়, তারা খুশূ-খুযূর সাথে একাগ্রচিত্তে ছালাত আদায় করে। সুতরাং তারাই মহান আল্লাহর কাছে সফলকাম, তারাই মুত্তাক্বী, তারাই জান্নাতী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾ ‘মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের ছালাতে থাকে বিনয়ী’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১-২)*। বিপরীতে যারা ছালাতে অমনোযোগী বা উদাসীন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾ ‘দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে থাকে উদাসীন’ *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৫)*। উপরে উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, উদাসীন ও অলস মুছল্লীরা জাহান্নামী হবে এবং কেবল মনোযোগী মুছল্লীরাই জান্নাতী হবে আর তারাই সফল মুমিন। কেননা হৃদয় মনোযোগী হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোযোগী হয়।

(৩) মুমিনরা অনর্থক কথা ও কাজ এড়িয়ে চলে: মুমিনের আরেকটি গুণ হলো- তারা কখনো অনর্থক কথা বা কাজে

* অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হামীদ আল-আছারী, আল-ওয়াজীয ফী আক্বীদাতিস সালাফিছ ছলেহ, পৃ. ১০৩।
২. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়্যাহ, পৃ. ৪১৫।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৮।

লিপ্ত হয় না অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে, যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং যাতে কোনো ফল লাভও হয় না। শিরক ও বিদআতসহ সকল প্রকার পাপ কাজ ও অশ্লীল কথাসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾ 'আর যারা অনর্থক কথা-কর্ম থেকে বিমুখ' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৩)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ 'মানুষের ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা'।[৪] এমনকি তারা অনর্থক কথা-কাজের কাছাকাছি হলেও সম্মান বাঁচিয়ে তা পরিত্যাগ করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا﴾ 'যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা সম্মান বাঁচিয়ে তা অতিক্রম করে' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭২)*। মুমিনরা ভালো কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে, এটাই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে'।[৫]

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ + أَرْبَعٌ قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةْ
اتَّقِ السَّيِّئَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا + لَيْسَ يَعْنِيكَ، وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّةْ

অর্থাৎ আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম ভিত্তি হলো চারটি কথা, যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। (ক) মন্দ থেকে বেঁচে থাকো, (খ) দুনিয়াত্যাগী হও, (গ) অনর্থক বিষয় পরিহার করো এবং (ঘ) (ভালো) নিয়্যতের সাথে কাজ করো।[৬]

(৪) মুমিনরা নিয়মিত যাকাত প্রদানে সক্রিয়: মুমিনের গুণাবলির অন্যতম হলো যাকাত প্রদানে তারা কখনো অবহেলা করে না। বরং যথাসময়ে তারা যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ﴾ 'আর যারা যাকাত প্রদানে তৎপর' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৪)*। এটি যাকাত দেওয়ার অর্থই প্রকাশ করে। এখানে যাকাত দ্বারা আর্থিক যাকাতও হতে পারে, আবার অন্তরের পবিত্রতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। লোক দেখানো যাকাত কবুল হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ 'সফলকাম সেই মুমিন, যে তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেছে আর ব্যর্থ হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে তার হৃদয়কে কলুষিত করেছে' *(আশ-শামস, ৯১/৯-১০)*। অতএব, পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যে তার মাল ও হৃদয় দুটিকেই পরিশুদ্ধ করেছে।

(৫) মুমিনরা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে: মুমিনের আরেকটি গুণ হলো লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গকে হেফাযত করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ- إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ﴾ 'যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে, নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত। কারণ এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দিত হবে না। অতএব, যারা এছাড়া অন্য কিছু কামনা করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫-৭)*। অর্থাৎ তাদের বিবাহিত স্ত্রী অথবা যুদ্ধলব্ধ দাসীর সাথে শরীআতের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূরণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করার আর কোনো পথ হালাল নয়। যৌন বাসনা পূর্ণ করার রাস্তা মাত্র দুটি— স্ত্রী-সঙ্গম অথবা দাসীর সাথে মিলন। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নিফাস অবস্থায় কিংবা পায়ুপথে সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীবজন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক আলেমের মতে, হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, যা মানুষকে নির্লজ্জতার দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না' *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হবে না; নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(আল-ইসরা, ১৭/৩২)*।

(৬) মুমিনরা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে: মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা সর্বদা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। কখনো আমানতের খেয়ানত করে না আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। আমানত হলো সাধারণত যার উপর মানুষ কাউকে নিরাপদ মনে করে। যেমন- গোপন কথা ও মালের আমানত রক্ষা করা। অঙ্গীকার বলতে বুঝায় আল্লাহর পক্ষ থেকে বা বান্দার পক্ষ থেকে যে সমস্ত অঙ্গীকার বা চুক্তি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ﴾ 'আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদার ব্যাপারে যত্নবান' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৮)*। আমানতের খেয়ানত করা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুমিনের গুণ নয়, বরং এ দুটি মুনাফিকের গুণ।[৭] অথচ মুসলিম দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করে এসব কাজ আমরা করছি। আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক আমানতসমূহের খেয়ানত করো না' *(আল-আনফাল, ৮/২৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلًا﴾ 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(আল-ইসরা, ১৭/৩৪)*। তাই আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করা সকলের অবশ্য কর্তব্য।

(ইনশা-আল্লাহ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৪. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭৬, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৮৩৯।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২।
৬. মিরক্বাত, 'ভূমিকা' অংশ, পৃ. ২৪।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯।

মুসলিম বিভাজন: অমুসলিমদের লাভের সুযোগ

-মো. শাহাবুদ্দিন*

ভূমিকা:
মুসলিম উম্মাহ এক সময় ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, ন্যায়বিচারের প্রতীক ও সভ্যতার পথপ্রদর্শক। কিন্তু বর্তমানে মুসলিমদের ভাঙন, অনৈক্য, দলাদলি ও বিভাজনের কারণে তারা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে অমুসলিম শক্তিগুলো। তারা কৌশলে মুসলিমদের বিভক্ত করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে।

১. ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ‘তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ‘নিশ্চয়ই মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পেছনে কথা বলো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও’।[১]

২. ইতিহাসে মুসলিম ঐক্যের শক্তি ও ভাঙনের ফল:

(ক) খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত: খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় মুসলিমরা রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী ছিল। ঐক্যের ফলেই ইসলাম ৩০ বছরের মধ্যে আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে পারস্য, বাইজান্টাইন ও মিসর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(খ) আন্দালুস (স্পেন): প্রথমে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ৭১১ সালে আন্দালুস জয় করে। পরবর্তীতে রাজ্য বিভাজন, মুসলিম রাজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব (Taif States) এবং খ্রিষ্টানদের সহায়তা চাওয়া মুসলিম স্পেনের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২]

(গ) উছমানীয় খেলাফতের পতন: উছমানীয় সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের প্রতীক। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবদের বিভক্ত করে ব্রিটিশরা ‘Sykes-Picot Agreement’ অনুযায়ী মুসলিম ভূখণ্ড ভাগ করে ফেলে।[৩]

৩. বর্তমান বাস্তবতায় মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও তার পরিণতি:

(ক) মাযহাবগত ও দলীয় বিভাজন: শীআ-সুন্নী বিভাজন, মাযহাব ও মতবাদের নামে একে অপরকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে। এর ফলে মুসলিম দেশে গৃহযুদ্ধ, হিংসা ও রক্তপাত বেড়েছে। যেমন- ইরাক, ইয়ামান, লেবানন, বাহরাইন প্রভৃতি দেশ।[৪]

(খ) রাজনৈতিক বিভক্তি: ওআইসি (OIC) এর মতো সংগঠন থাকলেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। যেমন- ফিলিস্তীন, রোহিঙ্গা, কাশ্মীর ইস্যুতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দ্বৈতনীতি।

(গ) সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিভাজন: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব, মিডিয়া আগ্রাসন এবং ইসলামী ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া মুসলিমদেরকে আত্মপরিচয়ের সংকটে ফেলেছে।

৪. অমুসলিমদের কীভাবে লাভ হচ্ছে?

(ক) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ বা অভ্যন্তরীণ বিরোধের অজুহাতে অমুসলিম শক্তিগুলো সামরিক ও কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ করে। যেমন- আমেরিকার ইরাক আক্রমণ (২০০৩), সিরিয়ায় রাশিয়া ও আমেরিকার হস্তক্ষেপ।

(খ) অর্থনৈতিক শোষণ: মুসলিম দেশগুলোর তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ব্যবহার করে অমুসলিম বহুজাতিক কোম্পানিগুলো লাভ করছে; অথচ মুসলিম দেশগুলো নিজেরাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

(গ) মিডিয়া যুদ্ধ: ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সক্রিয়। মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন তৈরি করতে ‘ইসলামোফোবিয়া’ ব্যবহার করা হচ্ছে।[৫]

৫. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য পুনর্গঠনে করণীয়:

(ক) ইসলামী শিক্ষার প্রচার: মসজিদ, মাদরাসা ও মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের একতা ও মাহাত্ম্যের বার্তা ছড়াতে হবে।

(খ) মাযহাবগত সহনশীলতা: মতভেদ থাকবেই, কিন্তু তা যেন বিভাজনের কারণ না হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে সংলাপ ও বোঝাপড়া বাড়াতে হবে।

(গ) তরুণদের জাগরণ: নতুন প্রজন্মকে ঐতিহাসিক শিক্ষা ও নেতৃত্ব গড়ার অনুপ্রেরণা দিতে হবে। তাদের প্রযুক্তি, নেতৃত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে।

(ঘ) OIC ও মুসলিম সংস্থাগুলোর পুনর্গঠন: এই সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে একটি অভিন্ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

উপসংহার:
মুসলিম উম্মাহর ভেতরে ঐক্য ফিরিয়ে আনাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জরুরী চ্যালেঞ্জ। ঐক্য ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং বিভক্তি মানেই পরাজয়। যেমনটা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা সম্মিলিতভাবে থাকো, কেননা বিভক্তি শয়তানের কাজ’।[৬]
আজ আমাদের সামনে দুটি পথ— বিভাজনে ধ্বংস হওয়া কিংবা ঐক্যে আবারও সম্মান অর্জন করা। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

* সহকারী শিক্ষক, বেল্লারমাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাজিয়ালি, যশোর।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪।
২. Hugh Kennedy, Muslim Spain and Portugal, (Routledge, 1996); Ibn Khaldun, Muqaddimah.
৩. David Fromkin, A Peace to End All Peace, 1989; Ottoman Archives and League of Nations records (1919–1924).
৪. Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future.
৫. Edward Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World.
৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৫৯৭।

ফিলিস্তীন সংকটে মুসলিম উম্মাহর করণীয়

*-মেহেদী হাসান সাকিফ**

ফিলিস্তীনের চিত্র আজও পৃথিবীর প্রতিটি মানবিক হৃদয়ে গভীর যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। পিতা তার সন্তানের ছিন্নভিন্ন দেহের অংশ দুটো টুকরো কাপড়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, মা চিৎকার করে কাঁদছেন, কারণ সন্তানের দেহের বাকি অংশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুদের লাশ পড়ে আছে, খুলি ফেটে চৌচির, কান দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত আর মগজ। ফিলিস্তীন, যেটি অতীতে অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিতে পূর্ণ ছিল, আজ অবৈধ ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের হাতে তছনছ হয়ে গেছে।

যারা এক সময় অনাহারী অবস্থায় ফিলিস্তীনে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের দেওয়া আশ্রয়ে এখন রক্ত ঝরছে। এত অত্যাচারের পরও মুসলিমরা মাসজিদুল আক্বছা এবং ফিলিস্তীন ত্যাগ করেনি। কারণ—

(১) ফিলিস্তীন হলো সেই পবিত্র স্থান, যেখানে অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন হয়েছিল।

(২) আল-আক্বছা ছিল কা'বার পূর্বে আমাদের প্রথম কিবলা এবং আল্লাহ তা কা'বার দিকে পরিবর্তন করেছিলেন।[১]

(৩) আল- আক্বছা হলো সেই মসজিদ, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন এবং যার আশপাশের স্থানকে পবিত্র ও বরকতময় ঘোষণা করেছেন। আর এখান থেকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিস্ময়কর যাত্রা মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল *(আল-ইসরা, ১৭/১)*।

(৪) শাম অঞ্চলের উপর ফেরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে রেখেছেন, যেখানে ফিলিস্তীন অন্তর্ভুক্ত।[২]

(৫) শাম হবে হাশরের ময়দান।[৩]

(৬) ফিলিস্তীনের লুদ এলাকায় দাজ্জালকে হত্যা করা হবে।[৪]

ফিলিস্তীন সংকট ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে করণীয়:

ফিলিস্তিন সংকট একটি দীর্ঘকালীন মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, যা শুধু আঞ্চলিক নয়, বরং ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তীনের জনগণ বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার ও ভূমি দখলের শিকার এবং এই সংকট সমাধানে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য অপরিহার্য। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে ফিলিস্তীনের জনগণের প্রতি সমর্থন জানানো এবং তাদের মুক্তির জন্য কাজ করা। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে করণীয় হলো—

(১) দু'আ ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া: ফিলিস্তীনের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে অধিক প্রার্থনা করা আবশ্যক। অন্তর থেকে প্রার্থনা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর সাহায্য এনে দেয়।

(২) ইসরাঈলি পণ্য বয়কট: ইসরাঈল পৃথিবীর একমাত্র ইয়াহূদী রাষ্ট্র, যা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং বিশ্বের নানা দেশে তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলিম হিসেবে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব ইসরাঈলি পণ্য বয়কট করা। যখন আমরা তাদের পণ্য বর্জন করব, তখন তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা তাদের ফিলিস্তীনিদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে বাধ্য করবে। আলেম-উলামা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৩) নিজেকে উত্তম মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা: নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনীর শিক্ষা অনুসরণ করা। এভাবে একজন মুসলিম হিসাবে নিজের জীবনকে উন্নত করতে হবে।

(৪) জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন: মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। কুরআনে কারীমের প্রথম নির্দেশ 'ইক্বরা' (পড়ুন) মুসলিমদের জন্য নির্দেশ। সঠিক জ্ঞান অর্জনই মুসলিম উম্মাহর উন্নতির পথ।

(৫) মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা: কুরআন-হাদীছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*। মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধভাবে একত্রিত করতে হবে, যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশায় আমরা একসাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি।

(৬) আখেরাতমুখী দুনিয়া: ইসলামের সোনালি যুগের মানুষ দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আখেরাতের জন্য কাজ করতেন। মুসলিম উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি

---

* দত্তপাড়া, টংগী, গাজীপুর।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪০।

২. তিরমিযী, হা/৩৯৫৪, হাদীছ ছহীহ।

৩. আহমাদ, হা/২০০১১।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭।

অতিরিক্ত ভালোবাসা ও মৃত্যুভীতি। ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা একদিন এভাবে দুনিয়ার স্বার্থের মোহে পড়ে মুসলিমদের উপর বিজাতিরা আক্রমণ করবে'।[৫] আমাদের উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়াবি লাভের সাথে আখেরাতের উদ্দেশ্যকে সমন্বয় করা।

(৭) ইসলামী শিক্ষা ও ছাহাবীদের আদর্শ: শৈশব থেকেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করা উচিত। ছাহাবীদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

(৮) শাসনব্যবস্থার জ্ঞান অর্জন: গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।

(৯) ফিলিস্তীন সচেতনতা বৃদ্ধি: ফিলিস্তীন সম্পর্কে বই, প্রবন্ধ, তথ্য, ছবি সংগ্রহ করে তা পরিবার ও সমাজে প্রচার করতে হবে, যাতে আমরা সবাই সচেতন হতে পারি।

(১০) ইখতেলাফি মাসআলায় ঐক্য বজায় রাখা: ইখতেলাফি মাসআলা নিয়ে পারস্পরিক বিভেদের বদলে এক আল্লাহর গোলাম ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(১১) অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া: মুসলিমদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা জরুরী। ব্যবসা ও আয়-উপার্জন করতে গিয়ে যেন ইসলামী শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয় এবং সেটি নেক আমল হিসেবে পরিণত হয়।

(১২) জ্ঞানগত দৈন্যতা কাটানো: মুসলিম উম্মাহকে জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে। কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছে এর গুরুত্ব রয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(১৩) ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতা থেকে মুক্তি: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের মাঝে যেসব বীজ বপন করেছে, তা থেকে মুক্তি পেতে হবে। একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো নিজের জাতি ও দেশের কল্যাণে কাজ করা।

(১৪) ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট না করা: মুসলিম যুবক-যুবতিদের উচিত নিজেদের মূল্যবান সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং পড়াশোনা ও উন্নতিতে মনোযোগী হওয়া।

(১৫) ফিলিস্তীনি ভাইদের জন্য আর্থিক সহায়তা: ফিলিস্তীন ও অন্যান্য অত্যাচারিত মুসলিমদের জন্য আর্থিক সহায়তা পাঠানো ও সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(১৬) আইটি সেক্টরে শক্তি বৃদ্ধি: মুসলিমদের জন্য আইটি সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে দক্ষতা অর্জন করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ করার জন্য এ সেক্টরে সময় ব্যয় করতে হবে।

(১৭) সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সহায়তা: সামাজিক মাধ্যম দ্বারা মুসলিমদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইসলামের পক্ষে কথা বলা।

(১৮) নারীদের ভূমিকা: নারী সমাজের উন্নতির জন্য তাদের যথাযথ শিক্ষা ও আদর্শ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। নারীরা মানবসভ্যতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

(১৯) পরিবারের দ্বীনের পথে চালনা: পরিবারের সদস্যদের দ্বীনের পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত, যাতে পুরো পরিবার আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে পারে।

(২০) নারী ছাহাবীদের আদর্শ: নারীদের জীবন গঠন করতে হবে ছাহাবী নারীদের মতো, যেমন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তাদের আদর্শ অনুসরণ করলে একজন মুসলিম নারীও মহান চরিত্র অর্জন করতে পারেন।

উল্লেখিত এসব দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে আমরা ফিলিস্তীনসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

---

৫. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৭, হাদীছ ছহীহ।

জীবন-মৃত্যু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা

[২০ শাওয়াল, ১৪৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আওয়াদ আল-জুহানী*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে সঠিক পথের দিশা চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আমাদের নিজেদের খারাপ প্রবৃত্তি ও মন্দ কর্ম হতে। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মারা যেয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক' *(আন-নিসা, ৪/১)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথনির্দেশ। আর সব থেকে মন্দ কাজ হলো (দ্বীনের মধ্যে) নব উদ্ভাবিত কাজ আর প্রতিটি নব উদ্ভাবিত কাজই হলো বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই হলো গোমরাহী।

অতঃপর, আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। কেননা তাক্বওয়া মানুষকে উচ্চ মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়, অন্তরকে পবিত্র করে এবং চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে। অনেক সময় শারঈ বিভিন্ন বিধান ও উপদেশ দানের শেষে তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ তাক্বওয়া হলো এমন একটি শক্ত বন্ধন, যা শরীরের সব ইন্দ্রিয়কে আল্লাহর আনুগত্যমুখী করে। এটি এমন একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক, যা আল্লাহর আদেশ অমান্য করা থেকে বিরত রাখে এবং এটি সেই দৃঢ় সম্পর্ক, যা বান্দাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সংযুক্ত রাখে।

হে মানুষসকল! এই দুনিয়া অচিরেই শেষ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং এর সময় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এর সামান্য কিছু অংশই অবশিষ্ট রয়েছে, যেমন পানির পাত্রের তলানিতে কিছু ফোঁটা পানি অবশিষ্ট থাকলে পাত্রের মালিক তা বের করে আনার চেষ্টা করে। এই দুনিয়া হলো পরীক্ষা ও বিপদের স্থান। এখানে মুমিনদের পরীক্ষা করা হয় সুখ ও দুঃখ দ্বারা, কষ্ট ও স্বস্তি দ্বারা, সুস্থতা ও অসুস্থতা দ্বারা, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের দ্বারা, সন্দেহ-সংশয় ও প্রবৃত্তির লালসা দ্বারা এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যা প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর শেষ পরিণতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেইসব মানুষের জন্য মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন, যারা দুনিয়ার পরীক্ষা ও কষ্টের সামনে ধৈর্যধারণ করে। তিনি বলেন, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জানমাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫-১৫৭)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা খুব শীঘ্রই এই নশ্বর দুনিয়া থেকে এমন এক জগতে প্রস্থান করবেন, যা হবে চিরস্থায়ী।

আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই যে, আমাদের চারপাশ থেকে বাবা-মা, সন্তানসন্ততি, ভাই-বোন, প্রিয়জন ও প্রতিবেশীরা এ দুনিয়া ছেড়ে পরকালের পথে যাত্রা করছে। মৃত্যু হচ্ছে একটি অনিবার্য সত্য, যার মুখোমুখি সকলকেই হতে হবে। যা মহান আল্লাহ ছোট কিংবা বড়, ধনী কিংবা গরীব সবার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছেন। মর্যাদা, ক্ষমতা, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব কেউই এটাকে ঠেকাতে পারবে না। এমনকি দুর্ভেদ্য প্রাচীর কিংবা দুর্গের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। আর যদি মহান আল্লাহ কারও জন্য চিরস্থায়ী জীবন নির্ধারণ করতেন, তবে তা অবশ্যই হতো তাঁর নবী-রাসূলদের জন্য, বিশেষত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য, যিনি মানুষকে আল্লাহর সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছেন। তাই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কোনোভাবেই এটা থেকে পালানো সম্ভব নয়। যতই দীর্ঘ হোক আমাদের জীবনকাল, যতই অবস্থান করি মযবূত প্রাচীর কিংবা দুর্গের আড়ালে; তথাপিও আমাদের কাছে মৃত্যু এসে পৌঁছাবেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো' *(আন-নিসা, ৪/৭৮)*। তিনি আরও বলেন, 'বলো, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে' *(আল-জুমুআ, ৬২/৮)*। কাজেই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত এই জীবনের পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তার ভাবা উচিত যে, সে কোথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে, কী অবস্থায় তার আত্মা ক্ববয করা হবে, কারা তার জান ক্ববয করার জন্য আসবে, তার কবরের অবস্থা কেমন হতে পারে, তার কবর কি জান্নাতের কোনো বাগানের মতো হবে, যেখানে থাকবে প্রীতিকর সঙ্গী? নাকি জাহান্নামের গর্তের মতো হবে, যেখানে থাকবে ভীতিকর সঙ্গী? তার কল্পনা করা উচিত সেই অবস্থার কথা, যা তার জন্য অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে আসবে, আত্মা বের হওয়ার মুহূর্তের কষ্ট, যখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়িয়ে যাবে, জিহ্বা আটকে যাবে, দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়ে যাবে আর আত্মীয়স্বজন তাকে ঘিরে কান্নাকাটি করবে। তার ভাবা উচিত সেই সময়ের কথা, যখন তার সন্তানরা ইয়াতীম হয়ে পড়বে আর সম্পদ জমা থাকবে ধনভান্ডারে। যখন মানুষের সঙ্গে থাকবে কেবল তার অন্তরের সঞ্চিত আমল। মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে' *(আশ-শুআরা, ২৬/৮৮-৮৯)*।

অতএব, আপনারা আপনাদের ভালো আমল, সত্য কথা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত হোন। ভয়ংকর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এক অনিবার্য সফরের জন্য তৈরি হোন। ঘুম থেকে জেগে উঠুন, গাফলতি থেকে সাবধান হোন, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে দ্রুত এগিয়ে চলুন, সেখানে পৌঁছানো কঠিন হয়ে যাওয়ার পূর্বেই।

আপনারা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিন, কারণ সেটি চিরস্থায়ী আবাস। আর দুনিয়ার সঙ্গে এমন ব্যবহার করুন, যেন তা কেবল আখেরাতে পৌঁছার একটি সেতুবন্ধন মাত্র। (হে ভাই!) সেই অপরিচিত একাকী ঘরের কথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন সেই মাটি ও পোকামাকড়ের ঘরের কথা। আরও স্মরণ করুন সেই সংকীর্ণ কবরের কথা। আপনাকে যেন এই চিরন্তন মৃত্যু ও আপনজন থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার সময়কে কোনো কিছুতেই ভুলিয়ে না দেয়। আপনি অন্তরের পরিবর্তনকারী মহান আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। তাঁর কাছেই দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার আকুতি পেশ করুন।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমরা যেন মৃত্যুর সময় আল্লাহর ইবাদতের উপর অটল থাকতে পারি। জেনে রাখুন! ভালো মৃত্যু কেবল সেই ব্যক্তিরই হয়, যার ভিতরের জীবন সুন্দর। কারণ মৃত্যু এমন এক মুহূর্ত, যখন কোনো ভণিতা চলে না।

হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি যেন ভালো আমলের মাধ্যমে হয়। আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনটি যেন তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন হয়, যখন তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। হে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানদাতা! তুমি আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে তোমার প্রতিবেশী করে জান্নাতে রেখো।

نفعني الله وإيَّاكم بالقرآن العظيم، وبحديث سيد المرسلينَ، وأجارني وإيَّاكم من عذابه الأليم، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি রাজাধিরাজ ও চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, 'যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও

মহানুভব তোমার রবের চেহারা' *(আর-রাহমান, ২৬-২৭)*। আমি আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, যিনি তাঁর উম্মতের প্রতি দয়াশীল ও সদয় এবং বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের প্রতি অফুরন্ত দরূদ ও সালাম বর্ষণ করো।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসুন। আপনারা কখনোই একমাত্র দুনিয়াকে আপনাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু বা জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করবেন না। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে চলুন এবং আপনাদের মধ্য থেকে যে সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মারা গেছে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন। জেনে রাখুন! তারা তাদের পূর্বে কৃতকর্মের ফলের দিকে চলে গেছে এবং মহান দয়ালু আল্লাহর রহমতের দিকে গমন করেছে। তারা মহান আল্লাহর নিকটে তাদের জন্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে, যারা তাদের মৃত্যুতে ছওয়াবের নিয়্যতে ধৈর্যধারণ করেছে। আপনারা অবশ্যই শারঈ পন্থায় শোক প্রকাশ করবেন আর জাহেলী পন্থায় শোক প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন।

(হে ভাই!) আমলে ছালেহের দিকে দ্রুত অগ্রসর হোন। তাহলে শীঘ্রই আপনারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও কবুলিয়্যাত লাভ করতে সক্ষম হবেন। আপনারা আপনাদের সুস্থতার সময়ে অসুস্থতার জন্য, তারুণ্যের সময়ে বার্ধক্যের জন্য, অবসর সময়ে ব্যস্ততার জন্য এবং জীবনের সময় থেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

আপনারা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির, তাঁর শুকরিয়া আদায় ও ছাদাক্বা করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় করুন। তাহলে আপনাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক্ব দেওয়া হবে, সাহায্য করা হবে এবং সকল বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে।

বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে, পাপের পরই নেকীর কাজ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে। দুর্বল তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং অলীক আশায় বিভোর হয়ে থাকে।

হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি করো। ইসলাম ও তার অনুসারীদের সর্বত্র সাহায্য করো। ফিলিস্তীনসহ বিশ্বের যেসব স্থানে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের রক্ষা করো। হে আল্লাহ! অত্যাচারী ইয়াহূদীদের উপর তোমার শাস্তি কঠিন করো, তাদের সংখ্যা কমিয়ে দাও, তাদের ছিন্নভিন্ন করো, তাদের কাউকেই আর অবশিষ্ট রেখো না। হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলিম শাসককে তোমার কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী শাসন করার ও তোমার শরীআত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার তাওফীক্ব দান করো।

হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, জীবিত ও মৃত সবাইকে তুমি ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যারা তোমার একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে, তোমার নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নবুঅতের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের প্রতি তুমি দয়া করো। হে আল্লাহ! যখন আমরা তাদের মতো মাটির নিচে একাকী হব, যখন আমাদের আমলই একমাত্র সম্বল হবে; তখন তুমি আমাদের প্রতিও দয়া করো। হে আল্লাহ! যারা দুঃখ-কষ্টে আছে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও। যারা অসুস্থ, তাদের রোগমুক্তি দাও। যারা ঋণগ্রস্ত, তাদের ঋণমুক্ত করো- আমীন!

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য জিনিস
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যুদ্ধ নাকি ভয়ংকর নাটক?

*-ইবনু মাসঊদ**

কাশ্মীরের পেহেলগামে ২২ এপ্রিল সন্ত্রাসী হামলায় ২৮ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন ছিল হিন্দু পর্যটক। এই হামলার পরপর তদন্ত ছাড়াই ভারতের কসাই খ্যাত মোদি সরকার পাকিস্তানকে দোষারোপ করে। অথচ, ঘটনাস্থল থেকে পাকিস্তান ৪০০ কিলোমিটার দূরে। বর্তমান কাশ্মীরে সন্দেহের জেরে দেড় হাজারের মতো নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সন্দেহের জেরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার মুসলিমদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিচ্ছে। বর্তমানে কাশ্মীরের ৪০টি পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে বর্তমান ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক উত্তেজনায়। ভারত-পাকিস্তান প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনা হবে ইনশা-আল্লাহ।

জঙ্গিবাদ না সন্ত্রাসী হামলা?

বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াসহ ভারতপন্থি প্রতিটি মিডিয়া ফলোআপ করে প্রচার করছে—জঙ্গিবাদী হামলা। আজ পর্যন্ত জঙ্গি শব্দটির সংজ্ঞা তেমন কেউ দিতে পারেনি। তবে, ঠিকই জঙ্গিবাদ ট্যাগ দিতে পেরেছে। পেহেলগামের এই ঘটনাকে জঙ্গিবাদ বলা হাস্যকর ছাড়া কিছুই না। বিশ্ব মিডিয়ার মতে, যেকোনো সংবাদ প্রকাশের জন্য অবশ্য তথ্যবহুল প্রমাণ দরকার। তথ্যবহুল প্রমাণ না থাকলেও সুস্পষ্ট আলামত দরকার। এই ঘটনায় সুস্পষ্ট তদন্ত না হতেই বিশ্ব মিডিয়া জঙ্গি বলে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিল!

হামলাটা কারা করেছে?

সকলের মনে একটাই প্রশ্ন— এই হামলাটা কারা করেছে? হামলাটা কারা করেছে? এই বিষয়ে জানার আগে আমাদের বর্তমান কাশ্মীর প্রসঙ্গে কিছু তথ্য জানা আবশ্যক। কাশ্মীরে সবসময় ৫ লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী অবস্থান করে। পর্যটনকেন্দ্রে থাকে কঠোর নিরাপত্তা। তাহলে এই হামলা করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সহযোগিতা অবশ্যই আছে। এই ছোট্ট কাশ্মীরে ৫ লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী থাকার পরও সন্ত্রাসী হামলা হলে সেটা ভারত সরকারের নিরাপত্তাজনিত ব্যর্থতা অন্যথা 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' বলা চলে। অবশ্য The Registance front (TRF) নামে একটি মুজাহিদ বাহিনী নাকি এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। ঠিক এমন বিজ্ঞপ্তি অনলাইন দুনিয়ায় ভাইরাল হয়। আর সেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কয়েকটি বিশ্ব গণমাধ্যম বড় হেডলাইন দিয়ে নিউজ করেছে। অথচ, সত্যতা হলো The Registance front (TRF) এর বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা এই ঘটনার সাথে জড়িত নই। বরং আমাদের নামে ভুয়া এডিট করা বিজ্ঞপ্তির প্রচারণা চালিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'।

আমরা কেউ স্বচক্ষে দেখিনি, হামলা কে করেছে! তবে, বিশ্লেষকরা মনে করেন, কাশ্মীরে অবস্থানরত ভারতীয় নিরাপত্তাকর্মীরা এই হামলার সাথে জড়িত। কেননা, ২০০২ সালে গুজরাট সবরমতী এক্সপ্রেসে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কামরায় আগুন দেওয়া নিয়ে দাঙ্গা। অথচ, আদৌ এই ঘটনার সুষ্ঠু কোনো তদন্ত প্রকাশ করেনি ভারত সরকার। ভারত সরকার এমন অনেক রহস্যময় ঘটনার তদন্ত প্রকাশ না করে নিজের দোষ ঢাকায় ব্যস্ত থাকে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা:

২২ এপ্রিল কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর ২৩ এপ্রিল ভারত ঐতিহাসিক সিন্ধু চুক্তি স্থগিত, ভিসামুক্ত ভ্রমণ সেবা বাতিলসহ বর্ডার পারাপার বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে পাকিস্তান আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় ভারতের বিমান চলাচলে অর্থনৈতিক ধাক্কা পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ২৪ এপ্রিল স্থগিত করে ঐতিহাসিক শিমলা চুক্তি। ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখায় চলে গুলাগুলি। গুলাগুলি বন্ধ হয় ২৯ এপ্রিল। পাকিস্তান ভারতের একটি ড্রোন নিষ্ক্রিয় করে।

২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, আতঙ্কবাদী আশ্রয়স্থল ধ্বংসকারী গুরুতর শাস্তি আসন্ন। অন্যদিকে ২৮ এপ্রিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ভারত পাকিস্তানে হামলা চালাতে পারে বলে অবগত হয়েছি গোয়েন্দা সূত্রে। তাছাড়াও কাশ্মীরের পেহেলগামের এই ঘটনায় দুদেশের জনগণের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে! অনলাইন থেকে শুরু করে অফলাইনেও ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা তুঙ্গে।

বিশ্ব প্রতিক্রিয়ায় ভারত পাকিস্তান উত্তেজনা:

দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর উত্তেজনা বিশ্বে বড় প্রভাব ফেলবে। তাই বিশ্ব মোড়লরা সমাধান চায়। আমেরিকা আপাতত ভারত-পাকিস্তানের সাথে আলাদা আলাদা কূটনৈতিক বৈঠক করা শুরু করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের মিত্র চীনের দাবি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। ইরান অবশ্য ভারত-পাকিস্তানকে মিলিয়ে দিতে সহায়তা

* অর্গানাইজার, রেনেসাঁ লিটারেচার অ্যান্ড কালচারাল ডিপার্টমেন্ট, রেনেসাঁ ফাউন্ডেশন।

করতে চায় বলে জানিয়েছে। সঊদী আরব, তুরস্কসহ জাতিসংঘ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে শান্তি ফিরে আসুক এমন বিবৃতি দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে দুই দেশের মধ্যে আলাদা আলাদা বৈঠক করেছে। কূটনৈতিক সমাধান। চীন নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান করেছে। ইরান দুই প্রতিপক্ষকে শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলেছে। সঊদী আরব, তুরস্ক, জাতিসংঘ শান্তির পক্ষে জোর দিয়ে আলোচনার কথা বলেছে।

যুদ্ধ নাকি নাটক?

বর্তমান সময়ে এমন ঘটনায় ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনাকে একদল বিশেষজ্ঞ পূর্বপরিকল্পিত বলে মন্তব্য করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ। প্রথমে আমরা জানব কেন নাটক? বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য অনুযায়ী নিচে আলোচনা করা হলো—

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা:

কাশ্মীর একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হলেও ভারতের সংবিধান নয়; বরং কাশ্মীরের সংবিধানে কাশ্মীর পরিচালনা হতো। কাশ্মীরের আলাদা পতাকাও ছিল। কেননা, ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরের জন্য আইনে বলা হয়, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় আইন প্রযোজ্য হতো। তাছাড়া কাশ্মীর আলাদা একটি রাষ্ট্রের মতোই স্বতন্ত্র নিয়মে চলত। কাশ্মীরে তখন ভারতীয় কেউ জমি কিনতে পারত না। কাশ্মীরের সেই ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয় ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট। তার মধ্য দিয়ে কাশ্মীর ভারতের সংবিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য। তখন কাশ্মীরে ব্যাপক সেনা মোতায়েন করা হয়। যারা প্রতিবাদ করতে চায় তাদের ব্যাপক ধরপাকড় চলে। কাশ্মীরের নেতাদের গৃহবন্দী করা হয়। ভারত সরকারের যেকোনো আইন সংসদে পাশ করার পর এমন অত্যাচার করার অভ্যাস ইতিহাসেও পাওয়া যায়। কেননা, ভারত রাষ্ট্রটি চৈতন্যের থিউরিতে চলে।

বর্তমান সময়ে ভারত উত্তাল ওয়াকফ আইন নিয়ে। ওয়াকফ তথা মসজিদ-মাদরাসা কিংবা দ্বীনের স্বার্থে দান করে দেওয়াকে বুঝায়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের পাতায়—ওয়াকফ শব্দটির উপস্থিতি আছে।

ভারতের প্রতিটি রাজ্যে ১টি করে মোট ৩২টি স্ট্রেট ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড তার নিজস্ব এলাকার দায়িত্ব পালন করে। ওয়াকফ বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি বোর্ড একটি আইনি সংস্থা। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা হিসেবে সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল-এর সূচনা হয়। এটি ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। ভারতের ওয়াকফ আইনের ইতিহাস বলে, ভারত বিভিন্ন সময় ওয়াকফ আইন পরিবর্তন করেছে। যেমন: ১৯১৩ সালে ওয়াকফ ভ্যালেডেটিং আইন, ১৯২৩ সালে মুসলিম ওয়াকফ আইন, ১৯৫৪ সালে সেন্ট্রাল ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন, ২০১৩ সালে ওয়াকফ আইন (সংশোধন)।

অবশ্য ভারতের ওয়াকফ বোর্ডের সম্পদ সম্পর্কে জানা যায়, ৮ লাখ ৭২ হাজার সম্পত্তি ভারতের ওয়াকফ বোর্ডের। সম্পত্তির মোট আয়তন ১০ লাখ একর। রেলওয়ে এবং সামরিক বাহিনীর পর সবচেয়ে বেশি জমির মালিক ওয়াকফ বোর্ড। ১৪.২২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশী টাকায় যার মূল্য ১৭ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা।

ওয়াকফ বোর্ডে নতুন আইন নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য যুক্ত করা বাধ্যতামূলক। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, অমুসলিমরা প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করবে। ধর্মীয় কোনো কাজে নয়। শতাব্দী ধরে চলে আসা ওয়াকফ বোর্ডের ইতিহাসকে কলুষিত করেছে ভারত সরকার। যার ফলে ভারতের সংখ্যালঘু তথা মুসলিমরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

ওয়াকফ আইন প্রসঙ্গে অন্যতম একটি আলোচিত আইন হলো, ওয়াকফ বোর্ডের সকল সম্পত্তির দলীল-দস্তাবেজ সরকারকে দেখাতে হবে। ইতিহাসের সেই হাজার বছরের দলীলগুলো কোথায় পাবে ওয়াকফ বোর্ড? এই সুযোগে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো আদালতে মামলা করছে, এই মসজিদ আগে মন্দির ছিল। এই খানকা আগে মন্দির ছিল। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, বুলডোজার দিয়ে গুজরাটে মসজিদ ভাঙা হচ্ছে। অবশ্য ওয়াকফ বোর্ডের ২৫০টিরও বেশি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। এত আলোচনা করার একটাই কারণ, ভারত যখনি কোনো যুলুম করে তখন 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র চেষ্টা করে। বর্তমানে ভারতের মুসলিম ভাইদের উপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। ওয়াকফ আইন ইস্যুতে পুরো ভারত এখনো উত্তাল। তাই এটা ভারতের পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা।

বিশ্লেষণ:

পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে আগেও উত্তেজনা হয়েছে। সর্বোচ্চ কয়েকদিন গুলাগুলির পর সব সমাধান হওয়া স্বাভাবিক। উপরে উল্লিখিত কথার ব্যতিরেকে যুদ্ধ হলে কী কী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা? আর যুদ্ধ কি কখনো সম্ভব?

এক কথায় ভারত কখনো যুদ্ধে জড়াতে চাইবে না। কেননা, ভারতের সেভেন সিস্টার্স-সহ কয়েকটি এলাকা আগে থেকে স্বাধীনতা চায়। সুযোগে সৎ ব্যবহার করতে কেউ দেরি করে না। তারাও সেই সুযোগটা নিবে। সর্বোপরি, আপাতদৃষ্টিতে পাঠক মনে একটাই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, যুদ্ধ নাকি ভয়ংকর নাটক?

ইসরাঈলি পণ্য বয়কটের ডাক ও প্রসঙ্গ কথা

*-মুস্তফা মনজুর**

বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়েই সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু ফিলিস্তীনে বর্বর ইসরাঈলের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিপক্ষে অবস্থান। মূলত ফিলিস্তীনে ইসরাঈলের হামলা কেবল দেশ দখলের লড়াই নয়; এটি হচ্ছে আদর্শের লড়াই, দুটি সভ্যতার সংঘাত। অন্য কথায় বলা যায় বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান আপাদমস্তক বিপরীত দুটি সহস্রকালব্যাপী চলমান লড়াই। ফিলিস্তীন এখানে কেবল অনুষঙ্গ মাত্র।

মূল কারণ মুসলিম সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত। ফিলিস্তীন ও ইসরাঈল এখানে মুসলিম বিশ্ব আর পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানেই আমাদের মুসলিমদের চিন্তার বিষয়। ফিলিস্তীন কেবল একটা অঞ্চল নয়; এটা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি আর সভ্যতার প্রতিনিধি। তাদের পরাজয় মানে আমাদের সকলের পরাজয়। এখানে শীআ-সুন্নী, খারেজী-মুরজিয়া কিংবা মাযহাবী-সালাফী কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এখানে একটাই পরিচয় মুসলিম। আমাদের, মুসলিমদের, এই বিষয়টাই মাথায় ঢুকাতে হবে। অথচ এখানেই আমরা ব্যর্থ। অনেক মুসলিম দেশ ও ব্যক্তি এই দ্বন্দ্বটাই বুঝতে পারছেন না, কিংবা চাইছেন না। আমাদের মাঝেই সরাসরি ইসরাঈলের সমর্থক যেমন আছেন, তেমন আছেন নীরব সমর্থক। এটাই মুসলিম হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা।

মনে রাখতে হবে, ফিলিস্তীনের বিপক্ষে যত যুক্তি কিংবা ধারণাই আসুক, আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় দুই সভ্যতার সংঘাত। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষে দাঁড়ানো কিংবা তাদের পক্ষে কথা বলা নতুবা মনে মনে সমর্থন করাও ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী জায়েয নয়। ইদানীং ঈমান ও কুফরের সংঘাতটাও খুবই স্পষ্ট। সামনে এমন সময় আসছে, যখন আপনি মাঝামাঝি কোনো দলে থাকতে পারবেন না। ঈমান ও কুফরের কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে, নয়তো আপনার কার্যকলাপ কোনো একটার দিকে যাবে— হয় ঈমানের দিকে নয়তো কুফরের পক্ষে। এরই প্রস্তুতি এখন থেকেই নেওয়া উচিত।

আজকের পরিস্থিতিতে মুসলিম হিসেবে আমাদের করণীয় অনেক কিছুই আছে। আজ কেবল একটি ইস্যু নিয়েই লিখছি। সেটা হচ্ছে পণ্য বয়কট কিংবা বর্জন। ফিলিস্তীনের পক্ষে আজ বিভিন্ন পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হচ্ছে। এর কারণ ও যৌক্তিকতা রয়েছে। ঈমান, ইসলাম ও নিজের মুসলিম পরিচয় রক্ষার্থে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থবিরোধী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বয়কট করা আজ ঈমানেরই দাবি। এটা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জিহাদের ন্যায়, তেমনই অর্থনৈতিক জিহাদেরও অংশ বটে।

[এক]

প্রথমেই বলতে চাই, কেন আমরা পণ্য বয়কট করব? না জেনে হুজুগে পড়ে পণ্য বয়কট খুব একটা কাজের কথা না। স্মরণ রাখা দরকার, অমুসলিমদের সকল পণ্য ব্যবহার, তাদের সাথে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাজায়েয নয়। ব্যতিক্রম হচ্ছে সেসব পণ্য যেগুলো—

(১) সত্তাগতভাবে হারাম হয়। যেমন- মদ। সত্তাগতভাবে হারাম পণ্য মুসলিমদের উৎপন্ন হলেও হারাম।

(২) মুসলিমদের বিপক্ষে ব্যবহার করা হয়। এজন্যই অস্ত্র বিক্রি জায়েয হলেও, ডাকাতের কাছে অস্ত্র বিক্রি হারাম। এমনিভাবে যারা মুসলিমদের বিপক্ষে লড়াইয়ে রত, তাদের কাছেও অস্ত্র বিক্রি জায়েয নয়।

(৩) যার ব্যবসা লব্ধ অর্থ ইসলাম ও মুসলিমের বিপক্ষে ব্যবহার করা হয় কিংবা মুসলিমদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া সাধারণ নীতি হচ্ছে অমুসলিমদের পণ্য ব্যবহার নাজায়েয নয়। অতএব, আমরা ইসরাঈল বা অন্য মুসলিম-বিদ্বেষী দেশের যেসব পণ্য বয়কট করার কথা ভাবছি তা সত্তাগত নাজায়েয হিসেবে নয়; বরং তা মুসলিমদের বিপক্ষে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে। এর মধ্যে কিছু আছে যেগুলো ইসরাঈলের দখলদারিত্বের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, সেগুলো ব্যবহার করা নিশ্চিতই হারাম। বাকী যেসব পণ্য মুসলিমদের বিপক্ষে কোনোরূপ সরাসরি কাজে জড়িত নয়, ইসরাঈলের সেসব পণ্য বর্জনের কারণ হচ্ছে—জিহাদ।

আমরা নিশ্চয়ই জানি, জিহাদের একটি অংশ হচ্ছে বয়কট বা অবরোধ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারে বানূ নাযীরকে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। অর্থনৈতিক অবরোধও মূলত জিহাদেরই একটি অংশ। যদি সকল মুসলিম দেশ থেকে একযোগে ইসরাঈলের বা মুসলিম-বিদ্বেষীদের সাথে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা যেত, তা হতো সবচেয়ে ভালো উপায়। যেহেতু নানা কারণে তা করা যাচ্ছে না, সে হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের অবরোধ হিসেবেই আমি পণ্য বয়কটকে দেখছি। অর্থাৎ ব্যক্তির তরফ থেকে একপ্রকার অবরোধ হচ্ছে সে দেশের ও সে দেশ

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংশ্লিষ্ট পণ্য বর্জন করা। এটা আর্থিক জিহাদেরই একটি পর্যায়, যদি তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।

[দুই]

দ্বীন মানার ক্ষেত্রে আমাদের বাঙালিদের একটা খুব কিউট অভ্যাস আছে— যে কাজে রিস্ক আছে বা হুমকি-ধামকি আছে কিংবা কিছু হারানোর ভয় আছে, সে সব কাজে আমরা নেই। এই অজানা ভয়ে অনেকে এমন অনেক কাজ ছেড়ে দেন, যা খুব সহজেই করতে পারতেন।

এমনই এক সহজ কাজ পণ্য বয়কট। কোনো রিস্ক নেই, হুমকি-ধামকি নেই, থাকার মধ্যে আছে কেবল একটুখানি খোঁজাখুঁজির কষ্ট। এটাও আমাদের হয় না। চিরাচরিত রিস্ক ফ্রি লাইফের অভ্যাস এক্ষেত্রে আমাদের কাজে আসেনি। খুব সহজেই পণ্য বয়কটের মাধ্যমে আমরা দ্বীনের জন্য যে কুরবানী বা মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতাম, তা-ও কেন যে আমাদের দ্বারা হচ্ছে না— আমার বুঝে আসে না।

একসময় প্রশ্ন উঠত, পণ্য বয়কট করে কী লাভ? ইদানীং তা আর খুব বেশি উঠে না। কারণ গাযা ইস্যুতে পণ্য বয়কটের ফলাফল আমাদের সামনে। ম্যাকডোনাল্ড, কোকাকোলা বা স্টারবাকস্-এর মতো কোম্পানিরও লস আমাদের চোখের সামনে। আমাদের দেশেও ইসরাঈলী সমর্থক পণ্যের ভাটা কাল চলছে। কোকাকোলা বা পেপসির বিকল্প হিসেবে মোজো কেমন চলছে তা আশেপাশের দোকানে একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। মোজো নাকি সাপ্লাই দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, এমনি তাদের চাহিদা। সুতরাং, পণ্য বয়কট করলে যে আর্থিক প্রতিবাদটা হয় তা অন্তত সবাই বুঝে গেছে।

এরপরও কেন পণ্য বয়কট প্রসার লাভ করছে না? কেন দোকানে দোকানে এখনো সেসব পণ্যের সয়লাব? না দোকানি, না ক্রেতা কেউই পণ্য বয়কট খুব একটা আমলে নিচ্ছেন না। কেন?

মূল কারণ, ঈমানী। ঈমান বা ইসলাম এখনো আমাদের ততটা প্রিয় হয়ে উঠেনি যতটা হওয়া দরকার ছিল। আমরা এখনো ব্যক্তিস্বার্থকেই দ্বীনের চাইতে প্রাধান্য দেই। এমন মানুষদের প্রতি নছীহত, আমার না, খোদ কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের কথা— 'বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক্ব সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' *(আত-তাওবা, ৯/২৪)*। সহজ ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ব্যক্তি, সম্পদ বা জীবনোপকরণ এর কোনোটা যদি আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের চাইতে প্রিয় হয় তবেই বিপদ। আর কে না জানে, পণ্য বয়কট জিহাদেরই দুর্বল রূপ মাত্র। প্রকৃত জিহাদ তো অনেক দূরের কথা, দুর্বল ও রিস্ক ফ্রি জিহাদেই আমরা নেই। কারণ নিশ্চয়ই উপরে বর্ণিত তিন ক্যাটাগরির (ব্যক্তি, সম্পদ বা জীবনোপকরণ) কোনো একটা। তাহলে হেদায়াত তো দূরের কথা আল্লাহর শাস্তির অপেক্ষা করাই সম্ভবত আমাদের নিয়তি।

আর ব্যবসায়ী ভাইদের তো কোনো ওযর নেই। সরাসরিই তাদের কথা আয়াতে এসেছে। তারপরও দোকানে সেসব পণ্য টাল দিয়ে রাখুন, ব্যবসা করুন; আর আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আযাব আসবেই, তখন আর কিছু করার থাকবে না।

সুধী পাঠক! এরপরও স্বয়ং আল্লাহ তাআলার এই ধমকি কি আমাদের অন্তরে কোনো রেখাপাত করবে না?

দ্বিতীয় আরেকটা কারণ বলতে চাই। আমাদের অনেকে মন থেকেই চান পণ্য বয়কট করতে। কিন্তু করতে পারেন না, কারণ অলসতা। একটু খুঁজে বিকল্প পণ্য বের করা কিংবা একটু দূরের দোকানে গিয়ে সদাই করার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজী নন। ভাবেন, একদিন বা একবার করলে কী এমন ক্ষতি!

এদের অনেকেই আবার জিহাদের ময়দানে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। মনে মনে তৃতীয় মালহামা, হিন্দুস্তানের যুদ্ধ বা ইমাম মাহদীর সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। এমন আশাবাদী কেউ থাকলে স্বপ্ন দেখা ভুলে যান। যিনি ১০০ গজ দূরের দোকানে যাওয়ার কষ্টটুকু সহ্য করতে পারেন না, তিনি করবেন জিহাদ! আপনি চাইলেও আল্লাহর খাতায় আপনার নাম থাকবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত।

প্রিয় ভাই, এবার চিন্তা করুন একবার বা একদিন পণ্য বয়কট না করলে কী ক্ষতি, কার ক্ষতি। ভাই, ক্ষতি অন্যের না; আপনার নিজের। নিজের ঈমানী পরীক্ষায় আপনি ফেল, ইসলামের প্রতি মুহাব্বতের পরীক্ষায় আপনি ফেল, জিহাদের পরীক্ষায় আপনি ফেল।

অনেকে পণ্যের কোয়ালিটির কথা বলে পণ্য বয়কট না করার যুক্তি দেন। আরে ভাই, নিজের কোয়ালিটির খবর নিন। আপনার ঈমানের কোয়ালিটি, আমলের কোয়ালিটি ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কোয়ালিটি কোনোটাই তো ঠিক নেই। আর আপনি আছেন পণ্যের কোয়ালিটি নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, দু-একটা প্রোডাক্ট বাদে বাকী সব পণ্যই উনিশবিশ। মিডিয়ার কারণে আমরা কোনো কোনো প্রোডাক্টকে অপরিহার্য বানিয়ে নিয়েছি। অথচ বিকল্প পণ্য কোনো অংশেই খারাপ নয়। কেবল ব্যবহারের অভ্যস্ততা

প্রয়োজন। তাছাড়া ঈমান, ইসলামের জন্য না হয় খারাপ পণ্যই ব্যবহার করলাম। আর কে না জানে, আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করলে তাঁর প্রতিদান শতগুণে ফিরে আসে; উভয় জাহানেই— দুনিয়াতে যেমন, আখেরাতেও। আর ফিলিস্তীন ইস্যু তো আমাদের জীবনের প্রশ্ন, ঈমানের প্রশ্ন, পরিচয়ের প্রশ্ন।

[তিন]

এবার পণ্য বয়কট নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসার কথা আলোচনা করব। এ আলোচনায় উদাহরণ দিতে গিয়ে নানা ইস্যুতে নানা দেশের নাম আসবে। এগুলো তো কেবল উপমা মাত্র। বস্তুত ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থবিরোধী সব প্রতিষ্ঠানকেই বর্জন করা উচিত, হোক তা দেশি কিংবা বিদেশি কিংবা ইসরাঈলি বা ভারতীয়।

আমাদের অনেকেই বলে থাকেন, ইসরাঈলি পণ্য বর্জন করলে কীই বা লাভ। আমি একজন ইসরাঈলি পণ্য বয়কট করলেই বা কী না করলেই বা কী? তাতে ইসরাঈলের কী যায় আসে?

আসলেই, একজন ক্রেতা/ভোক্তা যদি ইসরাঈলি পণ্য বয়কট করেন, তাহলে কিন্তু বাহ্যত কোনো ক্ষতিই পরিলক্ষিত হয় না। ধরে নিলাম সারা বিশ্বে কেবল আপনি বা আমি একজনই মাত্র একটা পণ্য বর্জন করলাম। তাতে পণ্যের উৎপাদনে যেমন হেরফের হবে না, তেমনই লাভেও না। তবে তাত্ত্বিকভাবে কিছুটা লোকসান হবেই, তা যতই ক্ষুদ্রতর হোক, হয়তো দশমিকের পর আরও ৫০০০টি শূন্য যোগ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত শতাংশ পরিমাণ। মোটকথা হচ্ছে, যাররা (ন্যূনতম) পরিমাণ হলেও ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে যদি বিশাল একটা অংশ ত্যাগ করে, তবে ক্ষতির সে শতাংশ বাড়তে থাকবে, তার প্রভাব উৎপাদনেও পড়তে বাধ্য। অনেকটা বিন্দু বিন্দু জলের সাগরের মতো। এক ফোঁটা কমলে কোনো কিছুই কমে না, কিন্তু যদি এক ফোঁটা ফোঁটা করে কমতে থাকে একসময় পরিবর্তন চোখে পড়বেই।

এখন সুধী পাঠক! আমার/আমাদের ক্ষমতা তো অতটুকুই, নাকি? আল্লাহ তাআলা আমাকে/আপনাকে তো ১% বা ৫০% ক্ষতি করার সামর্থ্য দেননি। ফলে সেটা না করতে পারার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাও করবে না। কিন্তু আমার সামর্থ্য যতটুকু, ততটুকু যদি না করি, জিজ্ঞাসিত আমিই হব, আপনি না। সুধী পাঠক! এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কার কতটা ক্ষতি হলো, তা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমার দায়িত্ব আমি কতটুকু পালন করলাম। কীভাবে আমার ঘৃণা প্রকাশ করলাম।

আচ্ছা, এটা কি সম্ভব যে, যার দ্বারা বা যার ইন্ধনে আমার ভাই-বোন অত্যাচারিত হলো, আমি তার দোকান থেকেই চাল কিনে খাই! শুনতে কেমন লাগল। কেউ যদি এমন করে আপনি তাকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবেন না, তাই না? পণ্য বয়কটের মূল উদ্দেশ্য এখানেই। ক্ষতি কতটুকু কার হলো সেটা গৌণ বিষয়।

হ্যাঁ, আর্থিকভাবেও এই প্রতিবাদ কার্যকরী যদি সকলে মিলে এই কাজ করা যায়। আর এটা অসম্ভব কিছুও না। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, নিকট অতীতেই। আমরা, মুসলিমরা যদি একটু ঈমানের চোখ দিয়ে তাকাই, তাহলেই সম্ভব। আর কে না জানে, ইয়াহূদীদের জোর অর্থের কারণেই। ফলে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তারা তাদের পলিসি পাল্টাতে বাধ্য।

যাই হোক, পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু আবেগের কথা শেয়ার করি। এক লোক পেপসি পান করেন না; কারণ পেপসি ইসরাঈলি। তো, কোনো এক অনুষ্ঠানে একজন তাকে খুব জোরাজুরি করলেন পেপসি পানের জন্য। আর শেষ পর্যায়ে মোক্ষম যুক্তি (!) দিলেন যে, 'আপনি একজন খেলেই বা ইসরাঈলের কী লাভ, আর না খেলেই বা তার কী লোকসান। তাতে তো কিছুই হচ্ছে না। ফলে অযথা নিজেকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ। তার চাইতে খেয়েই ফেলুন'।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি মানছি আমি একজন না খেলে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু, লাভ-ক্ষতি আমি দেখছি না। আমার সমস্যা হচ্ছে পেপসি আমি খেতেই পারছি না। যখনই তা খেতে যাই, তখনই আমার চোখের সামনে ফিলিস্তীনি ভাইদের রক্তমাখা লাশ ভেসে ওঠে। আমার ভাইদের রক্ত লেগে আছে এমন খাদ্য আমি কীভাবে খাই'।

এরপর দ্বিতীয় ভদ্রলোক আর একটা কথাও বলেননি। আসলে বলার কিছু থাকেও না। লাভ-ক্ষতি এখানে আসলেই গৌণ; মুখ্য হচ্ছে অনুভূতি। এটা আদতেই চেতনার বিষয়, এত গভীর আবেগে কেউ তাঁর ভাইকে ভালোবাসলে কেবল পানীয় কেন, অনেক কিছুই ত্যাগ করা যায়। এখন আপনার ভালোবাসা আপনার কাছেই থাকুক। আপনি কী পণ্য, কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা আপনার হাতেই তোলা থাকল। ফিলিস্তীনি ভাইদের, তাদের শিশুদের, স্ত্রী-বোনদের রক্তমাখা ছবি উপেক্ষা করেও আপনি যদি তা ভোগ/ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আমি শতবার বললেই বা কী লাভ। মস্তকবিহীন শরীর কিংবা শরীরহীন শিশুর মাথা যখন আপনাকে জাগাতে পারে না, তখন আমি আপনার হাত-পায়ে ধরলেও কিছু হওয়ার কথা না।

আবার অনেকের জিজ্ঞাসা, কতটি দেশের পণ্য ত্যাগ করবেন? ভারত, চীন, ইউএসএ, ফ্রান্স সবাই তো একই দোষে দোষী। এভাবে বয়কট করতে থাকলে কিছুই তো ব্যবহার করার উপায় নেই।

খুব যৌক্তিক প্রশ্ন। তবে পণ্য বয়কটের ক্ষেত্রে ঠিক মানানসই নয়। আপনি যতগুলো পারেন সবগুলোই বয়কট করেন। সেটা নির্ভর করছে আপনার ঈমান, আমল আর তাক্বওয়ার উপর। সবগুলো যদি করতে পারেন, তাহলে তো নূরুন আলা নূর, সোনায় সোহাগা। আর যদি না পারেন যে কয়টি পারেন করুন।

এটা তো কোনো যুক্তি হতে পারে না যে, আমি যখন ভারতের পণ্য বয়কট করছি না, তাহলে ইসরাঈলেরটাও বয়কট করব না। বস্তুত এটা কোনো বিধিবদ্ধ আইনের অধীন না, এটা নিতান্তই আপনার ইখতিয়ারে। আপনি প্রেফারেন্স তালিকা নির্ধারণ করে না হয় বয়কট করুন। হ্যাঁ, এটা আমরা বলি যে, বয়কট যেন হয়, ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থে; নিজের জাগতিক স্বার্থের জন্য না।

আর প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশে যা বলা হলো, সেটাও অনেকটা খোঁড়া যুক্তি। ইসলামে এর সমাধানও আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, ওসব দেশ থেকে যেসব পণ্য আসে তা জরুরী বা আবশ্যকীয় পণ্য নয়। বেশিরভাগই বিলাসদ্রব্য, আর তা না হলেও এগুলোর বিকল্প পণ্য আছে। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, সেসব দেশের কিছু পণ্য এমন যে, এগুলো ছাড়া বাঁচার উপায় নেই (যদিও আমি এমন একটাও পাইনি), তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। আপনি কেবল সেটাই ব্যবহার করুন, ততটুকু যতটুকু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। নিজের শখ মেটানোর জন্য নয়। যেমনিভাবে জীবন রক্ষার খাতিরে শর্তসাপেক্ষে রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি খাওয়াও ইসলামে জায়েয রয়েছে। সে হিসাবে এসব দেশের পণ্য তো আর মূলত নাজায়েয নয়, বরঞ্চ কোনো ঈমানী কারণের প্রেক্ষিতেই আপনি বর্জন করছেন। ফলে জরুরী পরিস্থিতিতে সেসব পণ্য ব্যবহার করলে আপনার বয়কট ভঙ্গ হওয়ার কথাও আসে না।

আবার এটাও দেখা যায় যে, যতদিন ইস্যু গরম থাকে ততদিন পণ্য বয়কট করা হলো। কিছুদিন পর আবার সেই আগের অবস্থা। তাহলে কী দরকার এভাবে লোক হাসানোর? এটা অনেকেই বলেন। আমি নিজেই অনেকের মুখে শুনেছি। হ্যাঁ, এটা বাস্তব যে, অনেকেই এমন করে থাকেন। এটা নির্ভর করে উনার ঈমানের দৃঢ়তা কতটুকু এর উপর। তবে পরে আবার ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকবে বলে যে এখন বয়কট করতে পারবেন না, তা কিন্তু কোনো কাজের কথা না। প্রথমত, যতদিন করলেন ততদিন তো ছওয়াব পেলেন, প্রতিবাদ করলেন। আর কে-ই বা বলতে পারবে যে, আপনি একেবারেই তা বর্জন করছেন না। সেটাও তো হতে পারে।

একটা উদাহরণ দিই, পাপ করতে অভ্যস্ত হলে কি তওবা করার দরকার নেই? তওবা করুন, পুনরায় পাপ হয়ে গেলে আবার তওবা করুন। এভাবে একই পাপের জন্য ৭০ বার তওবা করলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করেন (আরবে ৭০ সংখ্যা সাধারণত অসংখ্য বুঝাতে ব্যবহৃত হতো, যেমন এককালে আমাদের সামাজিক সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল কুড়ি। এক কুড়ি দুই কুড়ি এভাবে হিসাব করা হতো)।

হয়তো বলবেন, যে পাপ আমি জানি যে আবার করব, তাতে তো তওবা পূর্ণরূপে হয়ই না। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, আপনি যদি ভবিষ্যতেও সে পাপ করার ইচ্ছা ত্যাগ না করেন তাতে তওবা যথাযথ হয় না। কিন্তু তাই বলে তওবা ছেড়ে দেওয়াটা নিতান্তই মূর্খতা, এটা শয়তানেরই চাল। কেননা তওবা পুরা না হলেও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) তো হয়, বান্দা আল্লাহমুখী তো হয়। এভাবেই হয়তো কোনো একদিন খালেছ তওবা নছীব হবে।

প্রিয় ভাই, পণ্য বয়কটও তেমনই। যতদিন পারেন করেন, যতগুলো পারেন করেন। আপনার ঈমান যতদিন আপনাকে এ পথে চালায় ততদিন চলুন। আল্লাহর দিকে আপনার এই পদক্ষেপের দরুন আল্লাহর রহমত আপনার দিকে আরও বেশি করে অগ্রসর হবে, তাতে হয়তো আপনি বাকী জীবনও এমনিভাবে চলতে পারবেন।

লোক হাসানোর যে কথা আমরা চিন্তা করি সেটা অমূলক নয়। আমাদের পরিবারের অনেকেই এমন বলে ফেলেন। আসলে যারা বলেন, তারা দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নন। ফলে তারা এসব বিষয় দুনিয়াবী ও সামাজিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন। না হয়, কিছুটা হাসি সহ্যই করলেন দ্বীনের জন্য, আল্লাহর জন্য।

তবে একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত, এভাবে দ্বীনের ইস্যুকে খেলতামাশার বস্তু যেন আমরা বানিয়ে না ফেলি। এটা মারাত্মক অপরাধ। হ্যাঁ, যদি খালেছ নিয়্যতে আমি কোনো আমল করি, তারপর তা ছেড়ে দিই; তারপর পুনরায় শুরু করি, আবার ছেড়ে দিই; আবার শুরু করি আবার ছাড়ি, তাতে সমস্যা ততটা মারাত্মক নয়, যতটা মারাত্মক হয় ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে কোনো আমলকে ধরা ও ছাড়া হয়। এরূপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

আরও একটা কথা আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত যে, 'ইয়াহূদীদের পণ্য যদি বয়কট করতে হয় তবে facebook amazon, ebay, google, IBM সবই করুন। দেখি আপনাদের কত জাযবা'। [এসব পণ্য কাদের সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, কিংবা মুসলিমদের বিপক্ষে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাও নিশ্চিত নই।]

ফলে আমাদের অনেকেই বয়কটের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। অথচ এই কথা শুনতে যৌক্তিক মনে হলেও আসলে

এর কোনো ভিত্তি নেই। অন্তত ইসলামী ব্যাখ্যানুসারে নেই। কেননা—

(১) সবাই সব পণ্য বয়কট করবে বা করতেই হবে এমন কোনো নির্দেশনা নেই। বরং যার যার ক্ষমতা, সামর্থ্য ও সুযোগ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। কেননা এটা ফরযে আইন বিধান নয়। এটা জিহাদের অংশ, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসার—আবেগের প্রকাশ। ফলে যার ঈমান যতটুকু দাবি করে তিনি ততটুকুই করবেন। যতদিন সম্ভব ততদিন করবেন। হ্যাঁ, উত্তম হচ্ছে সবকিছু, সবসময়ের জন্য বয়কট করা। তবে কেউ না করতে পারলে তিনি মুসলিমই না, বরং কাফের এমন বলার কোনো সুযোগ নেই; কেবল ঈমানের দাবি তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি এটুকু বলা যায়। অবশ্য কেউ ওদের কার্যকলাপকে ভালোবাসলে ঈমান থাকার সম্ভাবনা নেই।

(২) 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ' করার নীতি ইসলামে নেই। একটু বুঝিয়ে বলি। উদাহরণ হিসেবে facebook-ই সম্ভবত আদর্শ। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, 'ফেসবুক ইয়াহূদীদের দ্বারা পরিচালিত, তাতে মুসলিমদের স্বার্থের অনেক হানি করা হয়'।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফেসবুকে আপনার আসার কারণ কী? তাতে লাভ কতটুকু আর ক্ষতি কতটুকু? যদি ফেবু ব্যবহারে কোনোরূপ হারামে জড়িত না হোন (যেমন অশ্লীলতা ও বেপর্দা—এ দুটোই সবচেয়ে বেশি হয়) এবং আপনার নিয়্যত যদি নেক হয় তবে ফেবু ব্যবহার ছেড়ে দিলে ইয়াহূদীদের যে ক্ষতি, তার চাইতে আপনার ক্ষতি বেশি। এটা পরিমাপ করবে শারঈ মাসলাহা-মাফসাদা (লাভ-ক্ষতি) এর নীতি। যেমন আজ যদি ফেসবুক ব্যবহার না করতেন, তাহলে জানতেন কি, ফিলিস্তীনে কী হচ্ছে? জানতেন কি, এখন কী করা উচিত, কিংবা কখন মুসলিমরা সম্মিলিতভাবে কী আন্দোলন করছে? সম্ভবত আমাদের বেশিরভাগই জানতেন না।

অতএব, ঢালাওভাবে অন্য সব পণ্যের সাথে এসবের তুলনা করা মোটেও ঠিক নয়। কেননা কোনো পানীয় ত্যাগ করায় মুসলিম উম্মাহর কোনোই ক্ষতি নেই, তাছাড়া এসবের বিকল্পও আছে। অন্যদিকে ফেসবুকের বিকল্প যদি তৈরি করা যায় সেটাই সর্বোত্তম, না হওয়া পর্যন্ত সেটাকে নিজেদের কাজে লাগানোই বরং উত্তম। যেমন— দাওয়াতের কাজ করা, ইলম অর্জন করা, দেশের, মুসলিম উম্মাহর খবরাখবর জানা, নিজ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই উকায মেলায় যেতেন। কেন? কাফেররা যে উদ্দেশ্যে যেত সে উদ্দেশ্যে নয়, বরং দাওয়াতের জন্য। কারণ নানা এলাকার লোকের কাছে সহজে দাওয়াত পৌঁছানো যাচ্ছে। ফেসবুকও অনেকটা এমন। আপনার নিয়্যত ও পদ্ধতি যদি ঠিক থাকে, তবে সমস্যা নেই।

তবে লক্ষ রাখা উচিত এসব কাজে ফেসবুক ব্যবহার যেন আমাদের হারামে লিপ্ত না করে। কেননা এসব কাজ করার আরও অনেক মাধ্যম আছে, ফেবু একমাত্র মাধ্যম নয়। ফলে একটি সহজ পথ অনুসরণ করতে গিয়ে হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে সে পথ ব্যবহারও হারামই হয়।

(৩) তাছাড়া অমুসলিমদের সকল পণ্য ব্যবহারই যদি নিষেধ হতো, তবে যুদ্ধাস্ত্র, মোবাইল, বিমান এমন সবই তো নিষিদ্ধ হয়ে যেত। অথচ সেসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। মূলত যেসব পণ্য সত্তাগতভাবে হালাল, সেগুলো ব্যবহার করা হালাল, যদি তা প্রয়োজনীয় হয়, কিংবা উম্মাহর (ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক) কল্যাণে লাগে। আর যেসব পণ্য হারাম, তা কেবল অমুসলিম কেন, মুসলিমের তৈরি হলেও হারাম।

এসবের আলোকেই ফেসবুক ব্যবহারের বিধান কার্যকর হবে। কেবল একটি নীতি জেনে তা নিয়ে তর্ক করা জ্ঞানীদের মানায় না। ফেসবুক যিনি কল্যাণের কাজে, প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করবেন তার জন্য জায়েয। পাঠক খেয়াল রাখবেন, জায়েয বা বৈধ বলছি— ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, এমনকি উত্তম বলছি না।

অন্যথা যিনি হারামে লিপ্ত হয়ে পড়েন তাঁর জন্য, উম্মতের যত কল্যাণই তাতে চোখে পড়ুক, হারাম। সেক্ষেত্রে কল্যাণ-অকল্যাণ মূলনীতির আগে হালাল-হারাম মূলনীতি প্রযোজ্য হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ তাক্বওয়ার কারণে সব কিছুই বর্জন করতে পারেন, তাঁর নিকট থেকে আমরা দু'আর প্রত্যাশাই করি।

[চার]

পণ্য বয়কটের একটি কমন সমস্যা হচ্ছে অতিরঞ্জন ও অবিশ্বস্ততা। অর্থাৎ যেকোনো একটি তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হলো, অথচ দেখা যায় ইসরাঈলের সাথে এর বেশির ভাগেরই কোনো সম্পর্ক নেই। ভুল তথ্যের কারণে কোনো পণ্যের ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হলো। হ্যাঁ, এটা খুবই আপত্তিকর যে, ইসরাঈলি পণ্য বয়কটের ডাক দিয়ে যে তালিকা দেওয়া হলো, তাতে অন্য দেশের পণ্যের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। আপনি কোনো পণ্য পছন্দ না-ই করতে পারেন, সে সম্পর্কে মানুষকেও সচেতন করতে পারেন। কিন্তু তা নিশ্চিতরূপেই মিথ্যা বলে না। ধরে নিন, অমুক কোম্পানির মালিক কাদিয়ানী হওয়ায় তার প্রোডাক্ট আপনার অপছন্দের। কিন্তু মিথ্যা তথ্য দিয়ে আপনি যদি সে

কোম্পানির বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ট্যাগ দিয়ে প্রচারে নামেন তবে তা কীভাবে ইসলামী হয়?

অতএব, স্পেসিফিক্যালি পণ্যের নাম দেওয়ার পূর্বে সকলেরই উচিত সচেতন হওয়া। কেউ একজন একটি তালিকা দিল, আর আমি গ্রহণ করলাম, এমন করা একদমই উচিত না। অন্ততপক্ষে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি নিশ্চিত করুন—

(১) যিনি তালিকা করেছেন তিনি আপনার নিকট নিঃসন্দেহে দ্বীনদার এবং যার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত।

(২) নিজে যাচাই-বাছাই করুন, তারপর অন্যের সাথে শেয়ার করুন।

(৩) অন্ততপক্ষে তালিকায় রেফারেন্স এর উল্লেখ আছে কি না দেখুন। অন্তত যারা জানতে চান তারা যেন যাচাই করে নিতে পারেন।

এক্ষেত্রে আমাদের সমাজে নানারূপ লিফলেট বা তালিকা পাওয়া যায়। এসব তালিকার বেশিরভাগই ইন্টারনেট থেকেই সংগৃহীত। ফলে এর পরিপূর্ণ যথার্থতা নিরূপণ করা অনেকের জন্যই কষ্টসাধ্য। তাছাড়া এসব তালিকা inclusive নয়। অর্থাৎ ইসরাঈলের সাথে সম্পর্কিত সব পণ্যই সেসবে উল্লেখ করা হয় না; আদতে তা সম্ভবও নয়। ফলে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া এসব তালিকা প্রস্তুতির মূল ও অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস হচ্ছে ইন্টারনেট; ফলে বিশ্বস্ততার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমরা কী করব? সুধী পাঠক! একটু খুঁজুন, ঘাটুন। পেয়ে যাবেন। তাছাড়া যাকে বিশ্বস্ত মনে হয় তাঁর তালিকা ফলো করুন। এটা যৌক্তিক না যে, আপনি খুঁজবেন না বিধায়, কিংবা নিশ্চিত না বিধায় কোনো কিছুই বয়কট করবেন না। বরং সতর্কতার দাবি তো এটাই যে, আপনি খোঁজার কষ্ট না করতে চাইলে, আপনার প্রাপ্ত তালিকার সব কিছুই বর্জন করুন। মনে রাখবেন, ভোক্তা হিসেবে পণ্য ব্যবহার ও পছন্দ করার অধিকার আপনারই। কোনো কোম্পানি তাদের প্রডাক্ট ব্যবহার না করার জন্য আপনাকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে না। ফলে নিশ্চিত না হলে, প্রাপ্ত তালিকার সবকিছুই বর্জন করুন, সন্দেহমুক্ত থাকবেন।

আরেকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইসরাঈলি পণ্য বয়কটের দ্বারা আমরা কিন্তু কেবল ইসরাঈলি মালিকানাধীন কোম্পানির পণ্যের কথা বলছি না, বরং এ বয়কট প্রধানত আরও কিছু শ্রেণির পণ্যের ব্যাপারেও কার্যকর হবে। যেমন— যেসব পণ্য সরাসরি ইসরাঈলি প্রোডাক্ট; যেসব পণ্য অন্য দেশীয় কিন্তু ইসরাঈলের দখলদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত; যে সকল পণ্যের দ্বারা ইসরাঈল রাষ্ট্র উপকৃত হচ্ছে। যথা- কাঁচামাল জোগান দেওয়া ইত্যাদি।

সম্পূরক হিসেবে এবার আরও কিছু পণ্যের কথা বলি। মুসলিম হিসেবে এসব পণ্যও বয়কট করা উচিত। সেগুলোর অন্যতম হলো—

(১) যেসব প্রতিষ্ঠান সরাসরি ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের বিপক্ষে অবস্থান নেয় ও পৃষ্ঠপোষকতা করে। যেমন- ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার প্রসার।

(২) ফ্রান্সের প্রোডাক্ট। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননা, হিজাব-নিকাব নিষিদ্ধ ইত্যাদি এবং তা রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যে। ফ্রান্স ভবিষ্যতে যতই ইসলামপন্থি হোক, এর পণ্য জ্ঞানত আমরা কোনোদিনই ব্যবহার করব না। কারণ ইস্যু হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে। সেখানে কম্প্রোমাইজের কোনো সুযোগই নেই।

(৩) যেসব প্রতিষ্ঠান অমুসলিম ও কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। নানা জায়গায় বিশেষত উত্তরবঙ্গে মুসলিমদের কাদিয়ানীতে ধর্মান্তকরণ কাজে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত।

(৪) ভারতীয় প্রোডাক্ট। কারণ, সামজিক ও সাংস্কৃতিক ময়দানে এরাই মূলত এ দেশে ইসলামের মূল বিপক্ষ শক্তি। বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের আস্ফালন ও অনৈসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে এদের ভূমিকাই সর্বাধিক।

(৫) যেসব সংস্থার পণ্য দেশে অশ্লীলতার ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পরিচিত; পাশাপাশি দেশীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ।

এসব পণ্য বয়কট করা এখন সময়ের দাবি। মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয়, স্বকীয়তা রক্ষা করতে চাইলে, আল্লাহর রহমতের আশা করলে আর আখেরাতের সফলতা চাইলে এর কোনো বিকল্প নেই।

সুধী পাঠক! আমি জানি ফিলিস্তীনের বর্তমান ইস্যুতে এটুকুতেই, শুধু পণ্য বয়কটেই, আমাদের দায়িত্ব শেষ নয়। আমাদের দুর্বলতাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপাতত এসব পণ্যই যদি বয়কট না করতে পারি তবে বড় দায়িত্ব কীভাবে পালন করব। তার চাইতে বড় কথা, এসব পণ্য বয়কট না করতে পারলে জিহাদের জন্য আল্লাহর তালিকায় আমার নামই তো থাকবে না। বয়কট দিয়ে শুরু করতে পারলে নামটা আল্লাহর প্রিয় মানুষদের তালিকায় থাকার আশা রাখি। আর আশা রাখি আল্লাহর রহমতের। আমার সাধ্যমতো আমি এগুলো করলে আল্লাহর রহমত তো আমার দিকে আসার কথা। তাই নয় কি?

মার্চ ফর গাযা এবং কেরানীগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

১. মার্চ ফর গাযা: [১২ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার]

ভারতের দারুল উলূম দেওবান্দ, সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাজ্যের ডান্ডি ইউনিভার্সিটি— তিন দেশ ও দুই মহাদেশের এই তিন প্রতিষ্ঠান আমাকে গ্লোবাল নাগরিক হিসেবে গ্লোবাল চিন্তা করতে অনেক সহযোগিতা করেছে। নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উম্মাহ চেতনাকে বহন করে সকলের কল্যাণকামিতা এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার চিন্তা সবসময় বহন করার চেষ্টা করি। তবে আমাদের মতো রক্ষণশীল সমাজে এই ধরনের চিন্তা নিয়ে চলাফেরা করলে বহুমুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

উম্মাহ-কেন্দ্রিক চিন্তা থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরানার আলেম-উলামার সাথে স্বাভাবিক সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি। গত সরকারের নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের আলেম সমাজ ফুঁসে উঠলে সকল ঘরানার আলেমদের নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে একটি গ্রুপ তৈরি হয়। সেই গ্রুপটিতে শুরুতে শুধু শিক্ষাকেন্দ্রিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও বিগত সরকারের বিদায়ের পর বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেখান থেকে কিছু উদ্যোগ হাতে নেওয়া হলেও সবচেয়ে বড় উদ্যোগটি ছিল 'মার্চ ফর গাযা' আয়োজন করা। 'প্যালেস্টাইন সলিডারিটি মুভমেন্ট' নাম দিয়ে এমন একটি কাজের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলে দায়িত্বও বণ্টন করা হয়। বিভিন্ন ঘরানার উলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করে ভিডিও বার্তা নেওয়ার কাজটি শায়খ আহমাদুল্লাহ করেন। প্রশাসনিক অনুমতির বিষয়গুলো সোহাগ ভাই গ্রহণ করেন। মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ, প্রেস রিলিজ, ইমাম ও মুয়াযযিনের কাছে দাওয়াতপত্র ও ঘোষণাপত্র ইত্যাদি কাজের খসড়া তৈরির দায়িত্ব এসে পড়ে আমার উপর। সার্বিকভাবে সবকিছু ফাইনাল করা এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের দেখভাল করার দায়িত্ব পড়ে ফাহিম আব্দুল্লাহ ভাইয়ের উপর। স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

কাজের শুরুতে অতটা আগ্রহ না থাকলেও শেষের তিন দিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কাজের তুলনায় আমাদের টিম ছিল অনেক ছোট। সবকিছু ছিল এক প্রকার অগোছালো। এই ধরনের ফিল্ড প্রোগ্রাম আয়োজনের অভিজ্ঞতা অনেকের শূন্য। ফলত, বিভিন্ন ডিসিশন নিতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছিল। বিশেষ করে মার্চ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ অভিমুখে হবে নাকি সোহরাওয়ার্দী অভিমুখে হবে, মার্চ কোথায় থেকে শুরু হবে, কয়টা স্টার্টিং পয়েন্ট হবে, স্টার্টিং পয়েন্টগুলোতে কারা থাকবে, মেহমানরা পায়ে হেঁটে যাবেন নাকি ট্রাকে যাবেন, সকল মেহমান কোন স্পটে একত্রিত হবেন ইত্যাদি বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক কঠিন ছিল। সরাসরি কোনো প্রেস ব্রিফিং হবে নাকি শুধু প্রেস রিলিজ যাবে ইত্যাদি ডিসিশনগুলো নিয়েও অনেক দ্বিধা ছিল।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হবে। ৫টি স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে জনগণ আসবে। মেহমানগণ বায়তুল মুকাররমে একত্রিত হবেন, সেখান থেকে ট্রাকে করে মিছিলসহ তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবেন। সকলের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত ছিল সেখানে কোনো অতিথি বক্তব্য দিবেন না। সকলের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হবে, যা পাঠ করবেন দৈনিক 'আমার দেশ'-এর সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান।

অনুষ্ঠানের দিন যোহর ছালাতের পর সকল মেহমানের উপস্থিতিতে বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেব উক্ত সিদ্ধান্তগুলো সকলকে জানান। কারও দ্বিমত না থাকায় সকলে মিলে তারা মসজিদ থেকে বের হতে শুরু করেন। তবে ততক্ষণে বাহিরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে ছিল। লাখো জনতার উপচে পড়া ভিড়ে সকল নিয়ন্ত্রণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বায়তুল মুকাররম থেকে বের হতেই জনস্রোতে সকল পরিপল্পনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়। শুরুতে কেউ আর ট্রাকে না উঠে পায়ে হেঁটে মিছিল শুরু করেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমও ভেঙে পড়ে। ফলত, রাস্তার মধ্যে প্রচুর গাড়িও আটকা পড়ে যায়। যদিও স্বেচ্ছাসেবকগণ গাড়িগুলোকে আলাদা রাস্তা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। তবে জনস্রোতের তুলনায় সেই চেষ্টা ছিল নস্যি।

আমিও আমার জীবনে প্রথমবার এত ভিড় ঠেলে কোথাও যাচ্ছিলাম। খতীব সাহেব খাটো মানুষ হওয়ায় এবং তার পায়ের স্যান্ডেলও অনুপযোগী হওয়ায় তার অবস্থা ছিল খুব শোচনীয়। লাখো মানুষের ভিড় ঠেলে সোহরাওয়ার্দী পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের দেড় ঘণ্টার মতো সময় লেগেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশের পর। সেখানে জনতার চাপ ও ভিড় আরও বেড়ে যাওয়ায় এবং মাত্রাতিরিক্ত ধুলা চোখে-মুখে প্রবেশ করায় একদিকে যেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ঠিক তেমনি সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায়

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যারিকেড যতটুকু ছিল উদ্যানে প্রবেশের পরে সেটিও ভেঙে পড়ে। আমার সাথে শেষ পর্যন্ত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর চারজন কর্মী রিফাত, মুরসালিন, মাহফুজ ও আসিফ ছিল। তাদের সহযোগিতায় কোনোমতে স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হই। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় স্টেজে পৌঁছে আমি অন্যান্য মেহমানদের খুঁজতে লাগলাম তারা ঠিকমতো পৌঁছেছেন কি-না।

ধীরে ধীরে অন্যান্য মেহমানগণও পৌঁছতে লাগলেন। মূল মেহমানগণ উপস্থিত হয়ে যাওয়াতে অনুষ্ঠান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে যেহেতু সকলের অবস্থা ছিল এক প্রকার বিধ্বস্ত, ফলত স্টেজ পরিচালনায় সবকিছু এলোমেলো হতে থাকে। কুরআন তেলাওয়াতের পর একটি ডকুমেন্টারি দেখানোর কথা ছিল, কিন্তু মানুষের অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সেটিও বন্ধ করে দিতে হয়। স্টেজের ডান দিক থেকে জনগণের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যেতে থাকে। পরিস্থিতির হতবিহ্বলতায় মেহমানদের তালিকা ধরে স্টেজে উঠানো যায়নি। পরিচিত ও সামনে বসা চেহারা দেখে ডাকা হয়েছে। অতঃপর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি ঘোষণাপত্র পাঠের ঘোষণাটি দিয়ে দিই। 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক তার ঘোষণাপত্র পাঠ শুরু করেন। চারিদিক থেকে মানুষ স্রোতের মতো ভেঙে স্টেজের দিকে আসতে থাকে। ঘোষণাপত্র পাঠ শেষ হলে আমি স্টেজ থেকে নেমে যাই। স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় কিছু অসুস্থ রোগীর দায়িত্বে নিয়োজিত অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নিয়ে ভিড় থেকে বের হতে সক্ষম হই।

অনুষ্ঠানের বিশালতা ও ব্যাপকতায় আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে যাই। পরদিন থেকে ভারত, আমেরিকা এমনকি ইসরাঈলসহ সমগ্র বিশ্বের লিডিং পত্রিকাগুলোতে এই সমাবেশের নিউজ আসতে থাকে। সবচেয়ে ভালো লাগার জায়গাটি হচ্ছে, ঘোষণাপত্রে অনেকটা জোর করেই আমি বাংলাদেশের দ্বিতীয় গাযা হওয়ার আশঙ্কাটি যুক্ত করেছিলাম এবং এই সমাবেশ থেকে ভারত সরকারের কাছেও একটি বার্তা দেওয়ার চিন্তা মাথায় ছিল। আল-হামদুলিল্লাহ, সেই চিন্তাটি খুবই সফলভাবে কাজে দিয়েছে। সবগুলো মিডিয়া এমনকি ভারতীয় মিডিয়াও খুব ফলাও করে প্রচার করেছে যে, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা ও ওয়াকফ আইন ইত্যাদি নিয়ে মার্চ ফর গাযা সমাবেশ থেকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এই বিষয়টি আমাকে অনেক মানসিক তৃপ্তি দিয়েছে। মনে হয়েছে আমি একটি সফল অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। এই দিকে অনুষ্ঠানের পরের দিনই জানতে পারি বাংলাদেশ সরকার পুনরায় পাসপোর্টে 'ইসরাঈল ব্যতীত' (Except Israel) বিষয়টি বহাল করেছে, আল-হামদুলিল্লাহ।

উক্ত অনুষ্ঠানের অকল্পনীয় সফলতা বাংলাদেশ, ভারত ও সমগ্র বিশ্বে পজিটিভ মেসেজ দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যেকোনো সময় দেশের স্বার্থে ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে একতাবদ্ধ হতে পারে তার অন্যতম একটি প্রমাণ এই অনুষ্ঠানটি।

২. কেরানীগঞ্জ আল-ওয়ালিদাইন মসজিদ সফর: [১১ এপ্রিল ২০২৫, শুক্রবার]

এদিকে 'মার্চ ফর গাযা'র প্রস্তুতি চলমান থাকা অবস্থাতেই কয়েকটি বেদনাদায়ক সংবাদ আসে। কেরানীগঞ্জের একটি পুরাতন আহলেহাদীছ মসজিদ 'আল-ওয়ালিদাইন জামে মসজিদ'-এ হামলা করে দখল করে নেওয়া হয়েছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হাফিযাহুল্লাহ-এর একটি ইসলামী প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলেন। তাতেই যত রাগ একদল নামধারী মুসলিমের। তারা এই প্রোগ্রাম বন্ধ করার জন্য সকল সীমা অতিক্রম করে মসজিদটিই দখল করে নেয়। পরবর্তীতে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও বংশালের ইসহাক ভাইয়ের সহযোগিতায় মসজিদটি উদ্ধার করা হয়। একদিকে আহলেহাদীছ মসজিদ অন্যদিকে আব্বুর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে গিয়ে এই অবস্থা হওয়ায় আমার খুব অপরাধবোধ হচ্ছিল। এইজন্য মার্চ ফর গাযা আয়োজনের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি সেখানে জুমআর খুৎবা দিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই আমাদের 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর দায়িত্বশীলরা জানাচ্ছিলেন, সেখানে খুৎবা দিতে নিষেধ করেছে স্থানীয় থানা প্রশাসন। দ্রুত বিষয়টি বাতিল করে জনগণকে জানাতে হবে। 'মার্চ ফর গাযা' আয়োজনের মিটিংয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আমি এই মেসেজটি রিসিভ করতে পারিনি। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) সকালে এই মেসেজ দেখে আমি সরাসরি ওখানকার ভাইদের সাথে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে সব বিষয় খুলে বললে আমি তাদেরকে উক্ত মসজিদেই জুমআর খুৎবা দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করি। সেখানে পৌঁছলে রাস্তাতেই মাশাইল সালাফিয়া মাদরাসার দায়িত্বশীল ভাইগণ আমাকে রিসিভ করেন। তারা বলেন, সকল দ্বীনী ভাই তাদের মাদরাসায় অপেক্ষা করছেন। আমি যেন সেখানেই খুৎবা দিই। হামলা হওয়া মসজিদে খুৎবা দিলে অনেক ঝামেলা হবে। প্রশাসন থেকে নাকি শক্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী মাদরাসাগুলোতে নাকি লাঠিসোঁটা জমা করা হচ্ছে। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক খুৎবা দিলে তারা সবকিছু নিয়ে হামলা করবে। আমি তাদেরকে বললাম, উক্ত মসজিদে যদি আজ একজন ব্যক্তিও ছালাত আদায় না করে তবুও আমি একাই সেখানে খুৎবা দিব। আপনাদের কোনো দায়িত্ব নাই, সব দায়িত্ব আমার নিজের উপর। এইভাবে এক প্রকার জোরপূর্বক আমি আল-ওয়ালিদাইন মসজিদে পৌঁছি। সেখানকার ভাইয়েরা এবং মা-বোনেরা আমাকে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আমি তাদের চোখের কান্নামিশ্রিত ভালোবাসা ও মুখের তাকবীর ধ্বনি শুনে মনে মনে ভাবি, তাদের এই ভালোবাসার জন্য আমি জীবনও দিতে পারি, ইনশা-আল্লাহ।

উপস্থিতিদেরকে মসজিদে বসিয়ে তাদের মুখ থেকে কিছু কথা শোনার চেষ্টা করি। তাদের দাবি অনুযায়ী, থানা থেকে নাকি তাদেরকে এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, আজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক এখানে খুৎবা দিলে কোনো মসজিদের ইমামের চাকরি থাকবে না; সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোষণা করি, আজ যদি এখানে কোনো হামলা হয়, তাহলে আপনাদেরকে আমাকে রক্ষা করতে হবে না। আমি নিজেই সবার সামনে গিয়ে মার খাব; আমার লাশের উপর দিয়ে আপনাদেরকে মারতে আসতে হবে। আর যদি প্রশাসন কাউকে গ্রেফতার করতে আসে, তাহলে আমি সবার পক্ষ থেকে সকল দায় স্বীকার করে নিয়ে আমিই গ্রেফতার হয়ে যাব; আপনারা চিন্তা করবেন না। কেননা আজকের খুৎবার জন্য আপনারা দায়ী নন; আমি নিজেই দায়ী। এভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করলে তারা অনেকটা চিন্তামুক্ত হয় এবং খুশিতে তারা বলতে থাকে, তারা ও তাদের বাড়ির মহিলারা সবাই জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে।

জুমআর খুৎবা শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে সিভিল ড্রেসে একজন প্রশাসনের লোক সাক্ষাৎ করলেন আমার সাথে। তিনি আমাকে জানালেন, তারা দুই গাড়ি পুলিশ ফোর্সসহ মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন। আমি নিশ্চিন্তে খুৎবা দিতে পারি। কোনো সমস্যা হলে তারা হেল্প করবে। আমি প্রশাসনের এই সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখে যারপরনাই আশ্চর্য হলাম। কেননা স্থানীয় দ্বীনী ভাইদের বক্তব্য ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেল। মহান আল্লাহ যা করেন, কল্যাণের জন্যই করেন।

জুমআর খুৎবায় 'আছহাবুল উখদূদ'-এর ঘটনা তুলে ধরলাম। আল্লাহর উপর ভরসা ও ধৈর্যধারণ বিষয়ে উপদেশ দিলাম। খুৎবা শেষে গ্রামের নারী-পুরুষের আনন্দের বন্যা দেখলাম। তাদের চোখে-মুখের এই নির্ভেজাল আনন্দ আমাকে চিরদিনের জন্য তাদের কাছে ঋণী করে দিয়েছে। সেখান থেকে ফিরে পুনরায় 'মার্চ ফর গাযা'র কাজে যুক্ত হয়ে যাই এবং পরেরদিন শনিবার (১২ এপ্রিল) মার্চ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা সক্রিয় ছিলাম, ফালিল্লাহিল হামদ!

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া বায়তুল মামূর মসজিদ সফর: [১৭ এপ্রিল ২০২৫, বৃহস্পতিবার]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে জেদ্দার বিভিন্ন দাওয়া সেন্টারে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণের সুবাদে সাঈদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তার প্রতিষ্ঠিত 'কুরআন ও সুন্নাহ ফাউন্ডেশন' ব্যাপক কাজ করেছে, এখনো করে যাচ্ছে। কুরআন ও সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দাওয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাওয়া হয়েছে। এমনকি মক্তব-কেন্দ্রিক একটি ধারাবাহিক সফরও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আয়োজিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলার খবরটি অতি দ্রুততার সাথে আমার কানে পৌঁছে। আমি দেরি না করে সাথে সাথে উক্ত মসজিদটি দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তবে তার পূর্বে প্রশাসনের অবস্থা ও হেফাজত ইসলামের ভূমিকা জেনে নেওয়া জরুরী ছিল। সেই সুবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলে নিই এবং 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমানের সাথে কথা বলি। তাদের দেওয়া সময় অনুযায়ী, ১৬ এপ্রিল দিবাগত রাত ১২টার দিকে রাজশাহী থেকে রওয়ানা দিই। আমরা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে যাই। সেখানে হালকা বিশ্রাম ও নাশতা শেষে সর্বপ্রথম 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর মহাসচিব মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমান সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবচেয়ে বড় মাদরাসা জামিয়া ইউনুসিয়াতে যাই। সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ একটি মিটিং হয়। সেখান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গমন করি। পুলিশ সুপার একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। টাখনুর উপর কাপড়। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। নির্ধারিত কোনো দিবসের কোনো শিরকী কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত হন না। শহীদ মিনারে ফুল না দেওয়ায় তাকে নিয়ে বিভিন্ন দৈনিকে সংবাদও প্রকাশিত হয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ও উদার ব্যবহারের পরিচয় দিলেন। তার সাথে পরামর্শ করে সরাসরি পাঘাচংয়ে মসজিদের স্পটে চলে যাই। সেখানে সকলকে সাথে নিয়ে মসজিদের জায়গায় প্রকাশ্যে যোহরের ছালাত আদায় করি। ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত নছীহতমূলক কথা বলি। তারপর পার্শ্ববর্তী যে মাদরাসা থেকে উস্কানির তথ্য পাওয়া গেছে সরাসরি সেই মাদরাসায় গমন করি। সেখানে মাদরাসার কিছু মুরুব্বি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত থাকলেও অন্যরা পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন এবং সম্মানের সাথে আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছেন, কথা বলেছেন। সেখান থেকে বের হয়ে পুনরায় হেফাজতের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমান সাহেবের দারুল আরকাম মাদরাসায় গমন করি। সেখানে তার সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ শেষে মাগরিব ছালাত পড়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

পরিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই, ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশই বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মতভেদ থাকবে, তবে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করা যাবে না। পাকিস্তানে বিভিন্ন ফেরক্বার মধ্যে মতবিরোধ এতটা ভয়ংকর রূপ নিয়েছে যে, আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে বিভিন্ন ফেরক্বার আলেমদের হত্যা করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশকে বাঁচাতে চাইলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের মাতৃভূমিকে হেফাযত করুন- আমীন!

বাংলাদেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সফরকালে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীরের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ ও মন্তব্য:

বাংলাদেশের প্রতি তার পিতা আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর অনেক ভালোবাসা ছিল। যে বছরে বাংলাদেশের জন্ম হয় ঠিক সেই বছরেই আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ-এর জন্ম হয়। সেই বছর তার পিতা বলেছিলেন, আমার নবজাতক শিশু দুই টুকরা হয়ে মারা গেলে আমি অতটা কষ্ট পেতাম না, আজকে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়াতে আমি যতটা কষ্ট পেয়েছি। সেই সুবাদে ছোট থেকেই আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ-এর অন্তরেও বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। তার ভাষ্য অনুযায়ী, তার ফ্লাইট যখন প্রথম ঢাকায় ল্যান্ড করে, তখন বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল।

তিনি আরও স্মৃতিচারণ করে বলেন, তার পিতা যখন প্রথমবার বাংলাদেশে আসেন, তখন তিনি বলেছিলেন, দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বাংলায় বক্তব্য দিবেন। পিতার সেই স্মৃতিচারণে তিনিও বাংলা শিখতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তিনি মন্তব্য করেন, বাংলা ভাষার অক্ষরগুলো আরবী স্টাইলে লেখা হলে তার জন্য বাংলা ভাষা শেখা সহজ হতো। তিনি আরও বলেন, বাংলা বর্ণমালা আরবী স্টাইলে লিখিত হলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে কালচারাল মিক্সিং বাড়ত এবং কখনোই হয়তো দেশ ভাগ হওয়ার সুযোগ আসত না। বাংলা যেহেতু সংস্কৃত স্টাইলে লেখা হয় আর উর্দূ লেখা হয় আরবী স্টাইলে, সেহেতু চরম বিপরীতমুখী দুই ভাষা উভয় দেশের মানুষের পক্ষে বুঝা কঠিন হয়ে যায়। যা ধীরে ধীরে কালচারাল ও মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি করে।

তিনি বংলাদেশের মানুষের পোশাক-আশাক, চলাফেরা সবকিছু অবলোকন করে মন্তব্য করেন, সাংস্কৃতিকভাবে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের সাথে পাঞ্জাবের যতটুকু মিল আছে, তার চেয়ে বেশি মিল আছে পাঞ্জাবের সাথে বাংলাদেশের।

তিনি তার পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, তার পিতা সফর করতে ও মানুষের সাথে কথা বলতে কখনো ক্লান্ত হতেন না, ছোট কোনো প্রোগ্রাম হোক অথবা একক কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হোক। সদাসর্বদা তিনি মানুষকে সাক্ষাৎ দেওয়ার জন্য এবং সফরের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। দাওয়াতী ফিল্ডে কখনোই কোনো ক্লান্তি তার চেহারা ও মানসিকতায় প্রকাশ পেত না। তার পিতা প্রচণ্ড সাহসী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় কখনোই মানুষের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এই জন্য সর্বাবস্থায় সত্য বলতে বিন্দু পরিমাণ কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ তার নিজের জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, তার পিতা যখন মারা যান, তখন তারা সকলেই অনেক ছোট। একদিকে স্বামীর মৃত্যুর শোক, অন্যদিকে সন্তান মানুষ করার চাপে তার মাতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং পিতার মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে তার মাতাও মারা যান। তারপর পরিবারের সকল দায়দায়িত্ব বড় ভাই হিসেবে তার মাথায় চেপে বসে। এই জন্য কখনোই সেভাবে দেশের বাইরে পড়তে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সকল পড়াশোনা বাড়িতেই করতে হয়েছে। তিনি গতানুগতিক কোনো মাদরাসার ছাত্র ছিলেন না। বরং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে পিতার লাইব্রেরির অসংখ্য ইলমী বই তাকে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। তিনি এক পর্যায়ে কুরআন হিফয করে ফেলেন। এভাবে জেনারেল পড়াশোনার পাশাপাশি তার দ্বীনের জ্ঞানার্জনও চলতে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি জানার আগ্রহ থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক মাস্টার্স করেন। অতিরিক্ত মাস্টার্স করার কারণে পিএইচডি করার সুযোগ তিনি পাননি, তবে ইদানীং পিএইচডি শুরু করেছেন।

দাওয়াতী ময়দানে নিজস্ব স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে, তিনি তার পিতার রেখে যাওয়া জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ২০০৪ সালে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর জমঈয়তে আহলেহাদীছ এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পৃথক দুটি দল। সেই পৃথক দল থেকেই দাওয়াতী কাজ শুরু করেন তিনি। আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ তার জীবদ্দশাতেই রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে মারকাযী জমঈয়ত থেকে আলাদা হয়ে শুধু জমঈয়তে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে তার ভাই হিশাম ইলাহী যহীরের আগ্রহে মূল মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি এই শর্তে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাথে ঐক্য করার বিষয়ে একমত হন যে,

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৪০নং পৃষ্ঠায়

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

প্রফেসর ড. সাজিদ মীর* রাহিমাহুল্লাহ

আল-ইতিছাম ডেস্ক

ইলম, দাওয়াত ও নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতি টানলেন প্রফেসর ড. সাজিদ মীর রাহিমাহুল্লাহ—একজন প্রকৃত আলেম, রাজনৈতিক দূরদর্শী এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র। তাঁর ইন্তিকালের খবরটি পাকিস্তানসহ গোটা উপমহাদেশের ইসলামী অঙ্গনে যেন এক শোকাবহ ঝড় তুলেছে।

সাজিদ মীর ১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর পাকিস্তানের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত আলেম ও রাজনীতিবিদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর সিয়ালকোটির পরিবারভুক্ত। তাঁর পিতা আব্দুল কাইয়ূম মীর শিক্ষা বিভাগে স্কুল ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন।

ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা:

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন পসরুরে, যেখানে তাঁর পিতা কর্মরত ছিলেন। এরপর ম্যাট্রিক সম্পন্ন করেন গভর্নমেন্ট হাই স্কুল সিয়ালকোট থেকে। এফ.এ ও বি.এ সম্পন্ন করেন মারে কলেজ সিয়ালকোট থেকে এবং ইংরেজিতে এম.এ করেন গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর থেকে। এরপর জিন্নাহ ইসলামিয়া কলেজ সিয়ালকোটে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং এ সময়েই কুরআন হিফযের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তিনি জামিআহ তাকবিয়াতুল ঈমান (শিশমহল রোড, লাহোর) থেকে হাদীছের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষায় তাঁর অর্জিত ডিগ্রির মধ্যে রয়েছে— ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এম.এ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, প্রথম বিভাগ; বি.এ (পলিটিক্যাল সায়েন্স ও আরবী), মুররে কলেজ, ১৯৫৮; অতিরিক্ত বি.এ (ইকোনমিক্স), ১৯৬৫; অতিরিক্ত বি.এ (সাইকোলজি), ১৯৬৬। ধর্মীয় শিক্ষা: ফাযিল দরস-এ-নিজামি (জামিআহ ইবরাহীমিয়া, সিয়ালকোট, ১৯৭১), ফাযিল (জামিআহ তাকওয়াতুল ইসলাম, লাহোর, ১৯৭২), আলিমিয়্যাহ কোর্স (ওয়েফাকুল মাদারিস আস-সালাফিয়্যা)।

তিনি লেখাপড়ায় বহু পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন: মীর হাসান মেডেল (আরবীতে প্রথম স্থান), মুহাম্মাদ আলী মেডেল (ইংরেজিতে প্রথম স্থান), ইংরেজি ও উর্দূ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রথম স্থান ইত্যাদি।

কর্মজীবন:

পেশাগত জীবনে লেকচারার (ইংরেজি), জিন্নাহ ইসলামিয়া কলেজ, সিয়ালকোট (১৯৬০–১৯৬৩), ইনস্ট্রাক্টর ও সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (সিয়ালকোট ও লাহোর) (১৯৬৩–১৯৭৫), নাইজেরিয়ায় ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীনে সিনিয়র এডুকেশন অফিসার থেকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন (১৯৭৫–১৯৮৪), সর্বশেষ পদ: অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকারী এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

ধর্মীয় ও সাংগঠনিক দায়িত্ব:

তিনি ১০ জুন ১৯৭৩ সালে প্রথমবার কেন্দ্রীয় জমিয়ত আহলেহাদীছ, পাকিস্তান-এর 'নাজিমে আ'লা' নির্বাচিত হন। আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর জীবিত থাকা অবস্থায় বহুবার তাঁকে ভারপ্রাপ্ত নাজিমের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই পদে থাকেন। এরপর ২ মে ১৯৯২-তে তিনি আমীর নির্বাচিত হন এবং গত ৩২ বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

পয়গাম টিভি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর নেতৃত্বেই এই টিভি নেটওয়ার্ক চারটি চ্যানেল পরিচালনা করছে— পয়গাম উর্দূ, পয়গাম পশতু, কুরআন টিভি এবং ইউকে চ্যানেল।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে তাঁর স্থায়ী ছাপ:

প্রফেসর মীর রাহিমাহুল্লাহ-এর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল সংগঠনকে কাঠামোগত ও আধুনিক পথে এগিয়ে নেওয়া। তাঁর সময়ে জমিয়তের অধীনে দেশজুড়ে শত শত মসজিদ, মাদরাসা, দাওয়াতী কেন্দ্র এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তিনি সংগঠনের আর্থিক স্বচ্ছতা, আদর্শিক দৃঢ়তা এবং

* আমীর, কেন্দ্রীয় জমিয়ত আহলেহাদীছ, পাকিস্তান।

প্রশাসনিক গতিশীলতা নিশ্চিত করেন। তাঁর হাত ধরেই জমিয়ত আহলেহাদীছ একটি আধুনিক ইসলামী সংগঠনে রূপান্তর লাভ করে— যার রয়েছে নিজস্ব মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম (পয়গাম টিভি), প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

দাওয়াতী প্রচারে তাঁর বিপ্লব:

পয়গাম টিভির প্রতিষ্ঠা প্রফেসর সাজিদ মীর রাহিমাহুল্লাহ-এর দূরদর্শিতার এক বিরল দৃষ্টান্ত। আজ এটি উর্দূ, পশতু, ইংরেজিসহ একাধিক ভাষায় তাওহীদের আহ্বান ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বে। শুধু দেশেই নয়; বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মধ্যে আহলেহাদীছ চিন্তাধারাকে পৌঁছে দিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বে জমিয়তের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিণত হয় একটি সংগঠিত ও প্রভাবশালী আন্দোলনে।

ইসলামী রাজনীতিতে এক পরিচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত:

পাকিস্তানের সিনেটে টানা ছয়বার নির্বাচিত হয়ে প্রফেসর মীর রাহিমাহুল্লাহ ইসলামী মূল্যবোধ, শিক্ষা সংস্কার, উম্মাহর ঐক্য ও আন্তর্জাতিক মুসলিম ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন এমন একজন রাজনীতিবিদ যিনি রাজনীতিকে ব্যবহার করেছেন দ্বীনের খেদমতের হাতিয়ার হিসেবে; কখনো ব্যক্তিগত লাভ বা দলীয় স্বার্থে নয়।

আন্তর্জাতিক পরিচিতি:

তিনি বিশ্বখ্যাত ইসলামী সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামী-এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং ফিক্বহ কাউন্সিলের পাকিস্তান প্রতিনিধি।

তিনি বিশ্বের বহু দেশে ইসলামিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন— সঊদী আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, তুরস্ক, ফিলিপাইন, ইরাক, কুয়েত, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, কেনিয়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক জীবন:

তিনি পাকিস্তানে কয়েকবার সিনেট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সিনেট কমিটি অন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এর চেয়ারপারসন ছিলেন। কাশ্মীর কমিটি (২০০৯ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত), গিলগিত-বালতিস্তান সম্পর্কিত কমিটিরও প্রধান ছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান:

তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান শিক্ষক, গভীর গবেষক এবং বহুভাষাবিদ। তাঁর ইংরেজি ও ইসলামী স্টাডিজে উচ্চতর ডিগ্রি এবং গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক ফোরামেও সম্মানিত করেছে। তিনি ইসলামের মূল শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার সাথে কীভাবে একত্র করা যায়—সেই ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থ ও রচনাসমূহ:

খ্রিষ্টধর্ম: অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, ছহীহ মুসলিম –অনুবাদ ও সংশোধন, মাযা খাসিরাল আলাম মিন ইনহিতাতিল মুসলিমিন –অনুবাদ (মূল: মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী), আল-হিজবুল মাকবুল –আরবী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের ওপর নিয়মিত লেখালেখি করেন।

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য:

তিনি একজন নীতিনিষ্ঠ, বিশ্লেষণধর্মী, সাহসী, সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। পার্লামেন্টে তাঁর বক্তব্যে জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তির জোর, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও স্পষ্টভাষিতা প্রতিফলিত হয়। তিনি সাবলীল ও সুবক্তা এবং প্রজ্ঞাবান নেতা।

আজ তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় জমিয়ত আহলেহাদীছ পাকিস্তান একটি সক্রিয় ও সুসংগঠিত দল হিসেবে দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে।

অশ্রুসজল বিদায়:

প্রফেসর সাজিদ মীর রাহিমাহুল্লাহ-এর ইন্তিকাল কেবল একজন ব্যক্তির নয়; এটি একটি যুগের অবসান। তিনি রেখে গেলেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেটি আজ গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাওহীদ, হাদীছ ও ছহীহ আক্বীদার আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং প্রার্থনা করি— আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাক্বাম দান করেন, আর তাঁর রেখে যাওয়া খেদমতের ধারাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক্ব দেন- আমীন!

গরমে বাড়ছে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি: প্রয়োজন জনসচেতনতা

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

ভূমিকা:

গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এ সময় ডায়রিয়া, আমাশয়সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত গরমে হতে পারে হিটস্ট্রোক ও পানিশূন্যতার মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই তীব্র গরমে কিছু নিয়ম মেনে চললে নিজের ও পরিবারের সকলের সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সাধারণত, দেহের তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হিটস্ট্রোক হয়। হিটস্ট্রোক হলে মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে শরীরের তাপমাত্রা ১০৬° ফারেনহাইট বা তার বেশি পৌঁছাতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ তাপমাত্রায় থাকলে হিটস্ট্রোকের সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, কিডনি ও পেশিতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এটি যদি ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়, তবে হিটস্ট্রোক হতে পারে। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না পেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপমাত্রা ও প্রকটতা বাড়ছে। ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো হিটস্ট্রোক। এটি একটি চিকিৎসাগত জরুরী অবস্থা। তবে এই গরমে সামান্য সতর্কতার মাধ্যমে আমরা এই সমস্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি।

হিটস্ট্রোক কী?

অতিরিক্ত গরমে বাইরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে আমাদের শরীর নিজের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তখন ত্বকের শিরাগুলো প্রসারিত হয়ে অতিরিক্ত তাপ বাইরে বের করে দেয় এবং ঘামের মাধ্যমে শরীর শীতল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীর থেকে লবণ ও পানি কমে যায়। ফলে দেখা দেয় দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথা ঝিমঝিম, বমি বমি ভাব, পেশিতে ব্যথা, তীব্র পিপাসা ইত্যাদি। এ অবস্থার নাম ‘হিট ক্র্যাম্প’ বা ‘হিট এক্সহসশন’। অতিরিক্ত গরমে বা আর্দ্র পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ থাকলে বা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করলে শরীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তখনই ঘটে হিটস্ট্রোক।

হিটস্ট্রোক হলে আমাদের করণীয়:

১. হিট ক্র্যাম্প বা হিট এক্সহসশন দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত শীতল স্থানে নিয়ে যান। ফ্যান বা এসি চালিয়ে দিন।

৩. ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিন। কাঁধ, বগল ও কুঁচকিতে বরফ দিন তাপমাত্রা কমাতে।

৪. হিটস্ট্রোক হলে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

হিটস্ট্রোক থেকে বাঁচতে কিছু পরামর্শ:

১. প্রচুর পানি ও পানীয় জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন।

২. শরীরকে ডিহাইড্রেটেড হওয়া থেকে রক্ষা করে এমন খাবার খান।

উপকারী পানীয়:

১. **কাঁচা আমের শরবত:** শরীর ঠাণ্ডা রাখে ও পুষ্টিকর।

২. **তেঁতুলের শরবত:** শরীর ঠাণ্ডা করে, পানিস্বল্পতা রোধ করে।

৩. **ডাবের পানি:** প্রাকৃতিকভাবে শরীর ঠাণ্ডা করে ও খনিজ সরবরাহ করে।

৪. **আখের শরবত:** পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫. **লেবুর শরবত:** ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, শরীর সতেজ রাখে।

৬. **মাঠা:** প্রোবায়োটিক্স সমৃদ্ধ, হজমে সহায়ক।

৭. **অ্যালোভেরার শরবত:** হজম, পেটের সমস্যা ও গরমজনিত সমস্যা কমায়।

৮. **পেঁয়াজের রস:** গরমে উপকারী ও ঔষধিগুণে সমৃদ্ধ।

যা পরিত্যাগ করা উচিত:

১. **সফট ও হার্ড ড্রিঙ্কস:** শরীরকে ডিহাইড্রেট করে।

২. **অশুদ্ধ পানি:** পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

৩. **ফাস্টফুড ও তেলচর্বিযুক্ত খাবার:** হজমে সমস্যা ও শরীরে উত্তাপ বাড়ায়।

৪. **স্যালাইন সঠিকভাবে গ্রহণ করুন:** নির্দেশিত পরিমাণ পানির চেয়ে কম পানি দিয়ে খেলে ক্ষতিকর হতে পারে।

উপসংহার:

এই গরমে নিজের পাশাপাশি পরিবারের যত্ন নিন। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঢিলেঢালা পোশাক পরুন, ছাতা ব্যবহার করুন। গরমের সময় বয়স্ক ও শিশুদের বিশেষভাবে নজরে রাখুন। হিটস্ট্রোক একটি মারাত্মক সমস্যা হলেও সচেতনতা ও সতর্কতা থাকলে সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

বাংলাদেশের এক শান্ত গ্রাম মেহেরপুর, যেখানে জীবনের স্পন্দন প্রকৃতির মতোই সহজ আর সরল। এই গ্রামের নীরব কোণে মজিবরের ছোট্ট সংসার— স্ত্রী রহীমা আর ১০ বছরের একমাত্র পুত্র ফাহিমকে নিয়ে। মজিবর একজন সাধারণ কৃষক, নিজের জমিতে ধান চাষ করেন আর স্থানীয় হাটে একটি ছোট কাঁচাবাজারের দোকান চালান। তাদের জীবন মধ্যবিত্তের চিরায়ত হাসিমুখে বেঁচে থাকার এক সংগ্রামগাথা।

দারিদ্র্য কখনোই তাদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। বরং সততা, ধার্মিকতা আর আত্মসম্মানের দৃঢ় স্তম্ভে তাদের সংসার সর্বদা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ফাহিম, ছোটবেলা থেকেই নীতিবান ও ধর্মভীরু। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে সে। তার এই গুণ গ্রামের সকলের মন জয় করে নিয়েছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী হায়দার উদ্দীন, যার দিন ফাহিমের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলা ছাড়া যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

হায়দার উদ্দীন গ্রামের বড় হাটে একটি দোকান চালান এবং মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাপন করেন। তার দুই সন্তান— ফাহিমের সমবয়সী ছেলে সাদ্দাম ও পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে সাদিয়া। তবে হায়দারের প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ তার ছেলে সাদ্দাম। সে অত্যন্ত চঞ্চল, অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল। ছালাতের ধার ধারে না, কোনো ভালো কাজের প্রতিও তার আগ্রহ নেই।

প্রতিদিন ফাহিমের ভদ্রতা ও নম্রতা দেখে হায়দার উদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 'যদি আমার ছেলেও এমন হতো!'— এই আক্ষেপ প্রায়শই তার হৃদয়ে অনুরণিত হয়।

মসজিদে যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই মজিবর ও ফাহিমের সাথে হায়দার উদ্দীনের দেখা হয়। একদিন মসজিদে যাওয়ার পথে ফাহিমের সালাম শুনে হায়দার উদ্দীন বললেন,

—'আস-সালামু আলাইকুম, চাচা!'।

—'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, বাবা ফাহিম! কেমন আছো?'

—'আল-হামদুলিল্লাহ ভালো। আর আপনি?'

—'আমি ভালো আছি। কুরবানীর ঈদ তো প্রায় এসেই গেল, তোমাদের এবার কী কিনবে?'

—'আব্বা বলেছেন এবার গরু কিনবেন, ইনশা-আল্লাহ'।

—'মাশা-আল্লাহ! আমিও আজ সাদ্দামকে নিয়ে গরু কিনতে যাচ্ছি। চলো বাবা, ছালাতের সময় হয়ে গেছে, মসজিদে যাই'।

সেদিনই হায়দার উদ্দীন তার ছেলে সাদ্দামকে সাথে নিয়ে বাজার থেকে মাঝারি আকারের একটি গরু কিনে আনেন। কিন্তু সেই নিরীহ প্রাণীটি যেন সাদ্দামের হাতে পড়ে এক রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। গরুকে নিয়ে সে যা খুশি তাই করতে শুরু করল— ছোটদের ভয় দেখানো, অন্য কারো গরুর সাথে লড়াই লাগানো, এমনকি গরুর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা পর্যন্ত! গরুর প্রতি তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে এলাকার সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

আসলে সাদ্দাম একটি বড় গরু চেয়েছিল, কিন্তু হায়দার উদ্দীনের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবুও ছেলের জেদের কাছে হার মেনে তিনি ধারদেনা করে গরুটি কিনেছিলেন। অথচ ছেলেটি সেই সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধও দেখাল না।

ফাহিম, বয়সে সাদ্দামের সমকক্ষ হলেও তার ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না। কারণ সাদ্দাম তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। সাদ্দামের বাবা প্রায়শই ফাহিমের উদাহরণ দিয়ে তাকে শাসন করেন, যা সাদ্দাম কখনোই মেনে নিতে পারে না। তাই সুযোগ পেলেই সে ফাহিমকে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করে। ফাহিম এসব দেখেও নীরব থাকে। সে জানে, হায়দার চাচা তার ছেলেকে ভালো করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। তাই সাদ্দামের কোনো অপকর্মের কথা সে কখনো হায়দার চাচাকে বলে না। তবে যখনই সাদ্দাম তার গরু নিয়ে ফাহিমকে জ্বালাতন করতে আসে, ফাহিম নীরবে সেখান থেকে সরে যায়।

ফাহিমের মনে চাপা কষ্ট হয়। প্রতি বছর তাদের পরিবার ছাগল কুরবানী করে আর অন্যরা গরু নিয়ে দম্ভ করে বেড়ায়। তাই রোজার ঈদের পর থেকেই ফাহিম তার বাবাকে অনুরোধ করেছিল, যেন এ বছর তারা গরু কুরবানী দেয়। ঈদের সেলামি হিসেবে পাওয়া নিজের জমানো টাকাও সে এর জন্য আলাদা করে রেখেছে।

মজিবর ভালো করেই জানেন যে, তাদের আর্থিক সামর্থ্য গরু কেনার মতো নয়। তবুও তিনি ছেলের ইচ্ছে পূরণের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কয়েকজনের সাথে ভাগে গরু কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তার স্বল্প অর্থের কারণে কেউই রাজি হয়নি। কারণ সকলেরই আগ্রহ বড় গরুর দিকে, যাতে বেশি মাংস পাওয়া যায়।

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

একদিন সন্ধ্যায় ফাহিম তার বাবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,
—'বাবা, আমরা কবে গরু কিনতে যাব?'

মজিবর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের গভীরে এক তীব্র কষ্টের ঢেউ অনুভব করলেন। কীভাবে তিনি বলবেন যে, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়? মুখে মিথ্যে এক হাসির রেখা টেনে বললেন,

—'শীঘ্রই যাব, বাবা'।

কিন্তু ফাহিম বাবার কণ্ঠের দুর্বলতা বুঝতে পারল। সে আবার বলল,

—'বাবা, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। তুমি চাইলে আমি সেই টাকাটা গরু কেনার জন্য দিতে পারি'।

কথাটা মিথ্যে নয়। ফাহিম রোজার ঈদে বেশ কিছু টাকা সেলামি পেয়েছে। আগের দুই ঈদের জমানো টাকাও তার কাছে রয়ে গেছে। সেই টাকাগুলো সে তার মায়ের কাছে জমা রেখেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ের কাছে গিয়ে নিজের সঞ্চয় দেখে আসে। তার মাও ফাহিমের কষ্টের এই অর্থ খুব যত্নের সাথে আগলে রাখেন। অবশ্য, যখনই কোনো আর্থিক সংকট দেখা দেয়, তখন ছেলের এই জমানো টাকা থেকে তিনি খরচ করেন এবং হাতে টাকা আসার সাথে সাথেই তা পূরণ করে দেন। তাই ফাহিমের তার এই সঞ্চয়ের উপর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে।

ছেলের কথা শুনে মজিবরের চোখ চিকচিক করে উঠল। এই টাকা তো তিনি ছেলের ভবিষ্যতের জন্য জমাতে বলেছিলেন, আর আজ সেই টাকাই ছেলে কুরবানীর গরু কেনার জন্য দিতে চাইছে! তার হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল, কিন্তু মুখে কোনো কথা সরল না।

এভাবে দিন পেরোতে লাগল, আর কুরবানীর ঈদের বাকি রইল মাত্র কয়েক দিন। সাদ্দাম তার ছোটখাটো গরুটি নিয়ে বেশ হইচই আর দাপাদাপির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ছোট গরু হলেও সে বড় বড় গরুর সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য প্রায়ই তাদের সাথে লড়াই লাগিয়ে দিচ্ছে। এতে তার গরুর সামান্য ক্ষতি হলেও সে যেন এক অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে। বিষয়টি ফাহিমের মোটেও ভালো লাগছে না।

সময় বয়ে যায়, কুরবানীর ঈদও প্রায় দরজায় কড়া নাড়ছে। এরই মধ্যে সাদ্দাম তার গরু নিয়ে নানা ধরনের অন্যায় কাজ করেই যাচ্ছিল। একদিন গরুকে এতটাই জোরে দৌড়াতে বাধ্য করল যে, গরুটি গুরুতরভাবে আহত হলো। পরের দিন সকালে ফাহিম জানতে পারল হায়দার চাচার গরুটি মারা গেছে। এক গভীর বিষণ্ণতা নিয়ে সে তাদের বাড়িতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল হায়দার উদ্দীন মৃত গরুর পাশে পাথরের মতো বসে আছেন, তার চোখে অশ্রুর বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে আর বুকের ভেতর যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

চারিদিকে তিনি অন্ধকার দেখছেন। আগামীকাল ঈদ আর এখন হাতে একটিও টাকা নেই। এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত, যখন তার মনে এই ভাবনাগুলো ভিড় করছে, ঠিক তখনই ফাহিম এসে দাঁড়াল তার সামনে। শান্ত স্বরে বলল,

—'চাচা, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর আফসোস করে কোনো লাভ নেই। বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়। এটা আল্লাহর পরীক্ষা'।

হায়দার উদ্দীন হতবিহ্বল হয়ে ফাহিমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফাহিম বাড়ি ফিরে এলো। মাকে সবকিছু খুলে বলল। তারপর মিনতি করে বলল,

—'মা, আমার জমানো টাকাটা দাও। আমি চাচাকে দেব'।

রহীমা প্রথমে অবাক হলেও ছেলের দৃঢ়তা দেখে আর দ্বিরুক্তি করলেন না। তার ছোট্ট ছেলে কী বলছে! মা একটু চিন্তা করলেন। তিনি জানেন হায়দার ভাই ফাহিমকে কতটা স্নেহ করেন। কিন্তু তাই বলে কি তিনি ছেলের কাছে টাকা চাইবেন? না, কখনোই না। তাহলে ফাহিম কি নিজেই টাকা দিতে চাইছে? যাই হোক, ছেলের উপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস। তাই কোনো কথা না বাড়িয়ে তিনি ছেলেকে তার জমানো ৪ হাজার টাকা দিলেন। ফাহিম টাকাটা হাতে নিয়েই দ্রুত হায়দার উদ্দীনের বাড়ির দিকে রওনা হলো। ছেলেকে টাকা দেওয়ার কথা ফাহিমের মা তার স্বামীকে জানালেন।

এদিকে হায়দার উদ্দীন তার স্ত্রীকে বললেন সাদ্দামকে ঘরে ডেকে আনতে। বাবার ভয়ে ছেলেটা না জানি কোথায় পালিয়ে গেছে। ফাহিমের কথা শুনে হায়দার উদ্দীন কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন এবং ধৈর্য ধরলেন। এখন কুরবানী কীভাবে দেওয়া যায়, তার একটা হিসাব মেলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ কুরবানী দিতে হলে আজই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু গরু কেনা তো দূরের কথা, একটা ছাগল কেনার মতো নগদ টাকাও তার হাতে নেই। কুরবানী উপলক্ষ্যে দোকানের জন্য তিনি বেশ কিছু মালামাল তুলেছেন, তাই হাতে তেমন নগদ অর্থ নেই। তাই ভাবলেন, কারো কাছ থেকে ধার করে হলেও একটা ছাগল কিনতে হবে।

এইসব দুশ্চিন্তার মাঝে ফাহিম এসে উপস্থিত হলো হায়দার উদ্দীনের কাছে। ততক্ষণে সাদ্দামও বাড়িতে ফিরে এসেছে। ফাহিমকে তার বাবার কাছে দেখে সাদ্দামের মনে হলো, ফাহিম নিশ্চয়ই তার নামে বিচার দিয়েছে। কারণ সে জানে,

তার খারাপ ব্যবহারের কারণেই গরুটি মারা গেছে, আর সেটা ফাহিমও দেখেছে।
টাকা হাতে নিয়েই ফাহিম হায়দার উদ্দীনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল,
—‘চাচা, এই টাকাটা রাখেন। একটা ছাগল কিনে কুরবানী দেন। এটা আমারই টাকা। ঈদের সেলামির টাকা’।
হায়দার উদ্দীন প্রথমে কোনো কথা বলতে পারলেন না। তার চোখ জলে ভরে গেল। এমন দিনে, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে, এত ছোট একটি ছেলের এই মহানুভবতা—তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি।
ফাহিম আরও বলল,
—‘চাচা, এই টাকা আমি মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। কোনো চিন্তা করবেন না’।
টাকাটা দিয়েই ফাহিম দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। হায়দার উদ্দীন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠিক তখনই তিনি তার ছেলেকে দেখতে পেলেন এবং বললেন,
—‘দেখেছিস, ভালো ছেলে কাকে বলে?’
সাদ্দাম বুঝতে পারল, সত্যিই তো, ভালো ছেলে তো ফাহিম। সে জানে, ফাহিম তার বাবাকে গরু কেনার কথা বলেছিল। কিন্তু তার বাবা গরুটি কিনতে পারেননি। এটা নিয়ে সাদ্দাম ফাহিমকে অনেক টিটকারিও মেরেছে। অথচ আজ তার গরু নেই, ছাগল কেনারও টাকা নেই, আর সেই মুহূর্তে ফাহিম তার জমানো টাকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।
অবশেষে হায়দার উদ্দীন মজিবরকে ডেকে আনলেন এবং সবকিছু খুলে বললেন। তারা দুজনে মিলে বাজারে গিয়ে দুটি ছাগল কিনে আনলেন— একটি ফাহিমের জন্য, অন্যটি সাদ্দামের জন্য।
কুরবানীর ঈদের দিনে দুটি পরিবারই আনন্দের সাথে ঈদ উদযাপন করল।
ঈদের ছালাত শেষে মজিবর ফাহিমকে কাছে ডেকে বললেন,
—‘বাবা, জানো কুরবানীর আসল শিক্ষা কী?’
—‘না বাবা’।
—‘কুরবানী মানে শুধু পশু যবেহ করা নয়; কুরবানী মানে হলো নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিকে আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ করা। আজ তুমি তোমার আনন্দ, তোমার স্বপ্ন—সব ত্যাগ করেছো অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য’।

‘বাংলাদেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

তাকে তার কুরআন ও সুন্নাহ মুভমেন্টের কাজ চালু রাখার অনুমতি দিতে হবে। এই শর্তে একমত হয়ে জমঈয়তে আহলেহাদীছ বিলুপ্ত ঘোষণা করে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের চীফ অর্গানাইজার হিসেবে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম শুরু করেন। অন্যদিকে অলাভজনক ফাউন্ডেশনের মতো কুরআন ও সুন্নাহ মুভমেন্টের কাজও চলমান থাকে। পরবর্তীতে এই ঐক্য বেশিদিন টিকেনি। ফলশ্রুতিতে তার ভাই হিশাম ইলাহী যহীর পুনরায় মারকাযী জমঈয়ত থেকে বের হয়ে জমঈয়তে আহলেহাদীছ নামে এবং তিনি নিজে কুরআন ও সুন্নাহ মুভমেন্ট নামে পুরোদমে নতুনভাবে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। যদিও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে শুধু অন্যান্য আহলেহাদীছের সাথে নয়, বরং অন্যান্য স্কুল অফ থটের অনুসারীদের সাথেও তারা একই প্লাটফর্ম বা একই মঞ্চ থেকে দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তিনি তার সকল জুমআর খুৎবা ও বিভিন্ন সাপ্তাহিক দারস-তাদরীস পাঞ্জাব শহরের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত লরেন্স রোডের মারকায থেকে প্রদান করে থাকেন। তিনি নিয়মিত মীনারে পাকিস্তান গ্রাউন্ডে ঈদের ছালাত পড়ান। ভয়ংকর করোনা মওসুমের লকডাউনের সময়েও তিনি তার প্রকাশ্য ঈদের ছালাত অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি সপ্তাহে দুইদিন নিয়মিত ‘দুনিয়া’ পত্রিকায় কলাম লেখেন। শুধু বাংলাদেশ সফর নিয়ে তিনি ৪টি প্রবন্ধ লিখেছেন। এত ব্যস্ততার মধ্যে কলাম কীভাবে লেখেন তা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, সফরের মধ্যেই তিনি অডিওর মাধ্যমে তার স্টাফের কাছে পাঠান। তার স্টাফ তার অডিও শুনে টাইপ করে পুনরায় তার কাছে পাঠায়। তিনি সংশোধন করে দিলে সেটিই পত্রিকায় চলে যায়। এভাবে কয়েক হাজার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
তার দৈনন্দিন রুটিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি নির্ধারিত কোনো মাদরাসায় কিতাব-ভিত্তিক দৈনিক কোনো দারসের সাথে সম্পৃক্ত নন। কয়েকবার কালোজাদুতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে যিকির-আযকার ও কুরআন তেলাওয়াতের পিছনে সময় ব্যয় করেন। ফজরের পর থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকির-আযকার ও তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকেন। সূর্য উঠলে বিশ্রামের জন্য ঘুমিয়ে যান। সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠেন এবং দৈনন্দিন কাজ শুরু করেন। কোথাও সফর থাকলে রওয়ানা দেন। মানুষজনের সাথে সাক্ষাৎ, কলাম লেখনী অথবা মারকাযে দারস ইত্যাদি সারাদিনের সকল কাজ শেষ করেন। রাতে খুব দ্রুত ঘুমাতে যান। রাতের ছালাত আদায় করেন। শেষ রাতে সুবহে ছাদিকের পূর্বেই উঠেন, ফজর পড়েন এবং পুনরায় যিকির-আযকারের মাধ্যমে দিন শুরু করেন।

ঈদের খুশি

-শফিকুল ইসলাম
শিক্ষক, গোবিন্দাসী উচ্চ বিদ্যালয়, ভুয়াপুর, টাংগাইল।

গগন কোলে চাঁদ উঠেছে
রাত পোহালে ঈদ,
খুশিতে তাই খোকা-খুকির
নেইকো চোখে নিদ।
ধনী-গরীব সবার ঘরে
বইছে খুশির বান,
মায়ের হাতের কোরমা পোলাও
পায়েস পিঠার ঘ্রাণ।
ফুল-পাখিরা উঠছে মেতে
ঈদের গানে গানে,
ঈদের খুশি ছড়িয়ে পড়ুক
সকল মুমিন প্রাণে।

চাঁদ উঠেছে

-এইচ. এম. মাহমুদুল হাসান আযীযী
শিক্ষার্থী, জামিয়া এমদাদিয়া আযীযুল উলূম পোকখালী, কক্সবাজার।

চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে নীল আকাশের গায়ে,
খোকা-খুকির মন মননে আনন্দ যায় বয়ে।
সকাল সকাল জেগে উঠে করবে তারা স্নান,
নতুন জামা পেয়ে তাদের খুশি হৃদয় প্রাণ।
দলবেঁধে বেড়াবে তারা এদিক-ওদিক ঘুরে,
রাস্তাঘাটে দেখলে মানুষ সালাম দিবে জোরে।

কুরবানী

-মিনারুল ইসলাম বিন ইউসুফ আলী
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

আয়রে সব গ্রামবাসী, চলো হাটে যাই,
হাটে গিয়ে কিনব গরু, সুঠাম দেহ, ভালো গাই।
ঈদের দিন বলবে সবাই, 'চলো মাঠে খালি পেটে',
হেঁটে হেঁটে যাব আমরা, তাকবীরের ধ্বনিতে, আনন্দে ভরে।
সবাই মিলে আদায় করব, ঈদের মাঠে ছালাত,
ছালাত শেষে কুরবানীর কাজে, থাকব হাসিমুখে একসাথ।
কাজ শেষে বলব সবার কাছে, 'রইল দাওয়াত আমার বাসায়',
আনন্দে মিলব সবাই, কুরবানীর এই আয়োজন ও মজায়।

ফিলিস্তীনের ঈদ

-মুহাম্মাদ মঈন
বলিয়াডাইং, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ঈদ আসে সব ঘরে ঘরে,
আনন্দে ভরে বিশ্বধরে—
শুধু ফিলিস্তীনে নয়!
সবাই যখন হাসে-গানে,
ওরা থাকে কান্নার টানে,
জানাযাতেই হয় ক্ষয়।
নিঃস্ব ওরা, ভূমি ছাড়া,
নিজের দেশে পরবাসী সারা—
খুঁজে পায় না সুখের ফুল।
ঈদের ছালাত ছেড়ে তারা
বুকে কফিন, চোখে ধারা—
লড়ছে মৃত্যুর সাথে কূল।
সবাই যদি বাঁচতে পারে,
ওরা কেন বাঁচে না তবে?
শিশুরাও খোঁজে আশ্রয়।
ঈদের চাঁদ উঠুক আবার,
রক্ত নয়, হোক আলো ঝলমল—
আকাশ হোক শান্তিময়।

ক্ষমা করুন

-কুলসুম বিবি
আজিমপুর রোড, ঢাকা।

হিংসা-বিদ্বেষ অন্তরে নেই
প্রভু জানেন সবই,
শিরক থেকে দূরে থাকি
শিরক খারাপ খুবই।
ওগো রহীম! ক্ষমা করুন
এই মিনতি করি,
শত গুনায় কাঁদি আমি
মুনাজাতে পড়ি।
দুহাত তুলে চাই যে ক্ষমা
আশা নাজাত পাব,
রবের কৃপায় নাজাত পেলে
ধন্য হয়ে যাব।

রক্তাক্ত গাযা

-হাফেয রফীকুল ইসলাম বিন আমজাদ
রামশার কাজীপুর, নলডাঙ্গা, নাটোর।

রক্তে ভেজা শিশুর মুখে, নেই কোনো হাসি,
বিধ্বস্ত ঘর, পুড়ে গেছে খেলনার বাসি।
আকাশ কাঁদে, বাতাস বোবা—
গাযা যেন এক শোকের ব্যথিত কবিতা।
মাটির নিচে স্বপ্ন গাঁথা, আগুন গিলে ফেলে,
মায়ের কোল খালি আজও, বুক ফেটে কেঁদে চলে।
একটা বুলেট, একগুচ্ছ প্রাণ,
একটি বোমা নিভিয়ে দেয় শত ঘরের প্রাণ।
কে বলবে আজ তারা সন্ত্রাসী?
তারা তো শুধুই বাঁচতে চায়, একটু স্বাধীন হাওয়ায়।
কিন্তু বিশ্ব চুপ— নিস্তব্ধ চারপাশ,
মানবতা আজ গোরস্থানে, দম্ভে ঝলসে গেল আশ্বাস।
মসজিদে পড়ে ছিল রক্তমাখা কুরআন,
আযান থেমে যায়, যখন বাজে বিমান।
তবু সাহস হারায় না তারা, গাযার বীর সন্তান,
তাক্বওয়ার তলোয়ার হাতে— শহীদির সম্মান।
হে মুসলিম, তুমি কি চুপ থাকবে আরও?
গাযা ডাকছে, বলছে, ‘তোমরা কোথাও যাও?’
উঠো, জাগো, কুরআনের সৈনিক হও,
দু‘আ করো, পাশে দাঁড়াও, আল্লাহর কাছে ঝুঁকে যাও।

ফিরে এসো রবের পথে

-শাহরিয়া নাফীস
শিক্ষার্থী, মাদারগঞ্জ আঃ আলী মির্জা কাশেম কামিল মাদরাসা,
কোয়ালিকান্দী, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

ওগো আমার প্রিয় ভাই, বুঝো না কেন হায়?
এই সমাজ যে ভাঙছে আজ, চোখ মেলে তো দেখো হায়!
দিন-রাত কাটাও গান আর খেলায়,
তবু কি মেলে শান্তি হৃদয়ের মেলায়?
এই দুনিয়া ক্ষণিক শুধু, থাকবে না কিছু চিরকাল,
হারাম প্রেমের মিথ্যা সুখে, কেন করো হৃদয় জ্বলন্ত খাল?
একদিন সব হবে শেষ, থাকবে না আর এই হাসি,
তখন দিতে হবে হিসাব, থাকবে না কেউ পাশে ভাসি।
তাকিয়ে দেখো কবরের ঘর—নীরব ডাকে বারবার,
আজও সময় আছে হাতে, ফিরো রবের দরবার।
ছালাত পড়ো, কুরআন ধরো, ফিরে এসো সোজা পথে,
এই দুনিয়া নয় আসল ঘর—চলো চলি আল্লাহর পথে।

দহনজ্বালা

-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন জনি
পশ্চিম বিন্নাপাড়া, দেউলকাঠি, ঝালকাঠি।

দুঃখের জ্বালা সইনা প্রাণে
মনের ব্যথা আল্লাহই জানে,
মনকে বাঁধি মনের টানে
আপনজনে আঘাত হানে।
বলতে আমি চাই না কিছু
সবাই করে আমায় নিচু,
চাইছি কলা পাইছি লিচু
ছুটছি মিছে সুখের পিছু।
বুকের মাঝে দহনজ্বালা
পরায় সবে কষ্টের মালা
মনের দুঃখে অন্তর কালা
পাই না আমি সুখের তালা।
জীবন নদী বইছে ছুটে
সবাই মাতে হরিরলুটে,
আমার বুকে আঘাত জুটে
মরছি আমি মস্তক কুটে।
চোখের জলে বালিশ ভিজে
সেসব কথা বলব কি যে?
দুঃখের ব্যথা সইছি নিজে
আপন লোকে আঘাত দিছে।
গলায় দিছি দুঃখের মালা
সবাই বলে হালার ফালা,
আমার ভাগ্য নয়কো ভালা
পেলাম শুধু দহনজ্বালা।

বিদায়ের যাত্রা

-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার
কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

যাত্রা সবারই শেষ হবে একদিন,
দেহ পড়ে রবে, প্রাণ হবে লীন।
কিন্তু কাজগুলো রবে অমর হয়ে,
বৃষ্টি-ধোয়া ফুলের মতো সুবাস নিয়ে।
ছুটো তবে আজই প্রভুর ডাকে,
ভালো কাজের আলোক-রেখা টেনে রাখে।
মৃত্যু তো নিশ্চিত, এ নয় অজানা,
কিন্তু সৎকর্ম চিরদিন থাকে গাঁথা।

বাংলাদেশ সংবাদ

সারাদেশে সরকারি ফার্মেসি চালু করছে সরকার, স্বল্পমূল্যে মিলবে ওষুধ

সারাদেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল চত্বরে সরকারি ফার্মেসি চালু করতে যাচ্ছে সরকার। এর মাধ্যমে ২৫০ ধরনের ওষুধ তিন ভাগের এক ভাগ দামে পাবেন সাধারণ মানুষ। গুণগত ও মানসম্পন্ন ওষুধ সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গত ৮ই এপ্রিল, ২০২৫ ইং, মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওষুধের খরচ কমিয়ে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের কাছে আরও সহজলভ্য করতে সরকারি ফার্মেসি চালু হলে, এর মাধ্যমে ৮৫ শতাংশ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব হবে, যা স্বাস্থ্য খাতের জন্য একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। তবে সরকারি ফার্মেসি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে ওষুধ চুরি ঠেকানোর চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা মোকাবিলা করতে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, প্রতি বছর সরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইডিসিএল প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার ওষুধ কিনে থাকে এবং এখন থেকে বাজেট বাড়িয়ে আরও বেশি পরিমাণে ওষুধ কেনা হবে। সরকারের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ সময় মতো সরবরাহ করা যায়, তা নিশ্চিত করা হবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

জন্মহার বাড়ানোর পরিকল্পনা চালু তুরস্কে

বিবাহের হার কমে যাওয়া, ডিভোর্স বাড়া এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগে পড়েছে তুরস্কের প্রশাসন। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে তুরস্ক সরকার। একইসঙ্গে জন্মহার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। ২০২৫ সালের শুরু থেকে দেশটিতে চালু হয়েছে একটি নতুন সরকারি কর্মসূচি, যার আওতায় সন্তান নেওয়া দম্পতিরা আর্থিক সহায়তা পাবেন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী, প্রথম সন্তানের জন্য দম্পতিদের এককালীন ৫ হাজার লিরা প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হলে প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০০ লিরা করে ভাতা দেওয়া হবে এবং তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে মাসিক ৫ হাজার লিরা করে সহায়তা দেওয়া হবে, যা প্রায় ১৩২ মার্কিন ডলার বা ১৬ হাজার বাংলাদেশি টাকার সমান।

ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্র বদল ও অমুসলিমদের সদস্য নিয়োগ নয়, বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্ট। ওয়াকফ আইনে স্থগিতাদেশ না দিলেও ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্র বদল করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। এছাড়া ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য নিয়োগ করা যাবে না বলেও জানায় সুপ্রিম কোর্ট। আগামী শুনানি পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। ১৯৪০ সাল থেকে 'ভোগদখলকরী ওয়াকফ' রয়েছে। নয়া সংশোধনী কার্যকর হলে সেই সমস্ত সম্পত্তির চরিত্র বদল করা হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় আদালতে। ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য নিয়েও প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। হিন্দু মন্দির বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অন্য সম্প্রদায়ের কেউ থাকে কিনা তাও জানতে চায় শীর্ষ আদালত। হিন্দু ধর্মের ট্রাস্টগুলোতে মুসলিমদের সদস্যপদ দেওয়া হবে কিনা কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে জিজ্ঞেস করেন প্রধান বিচারপতি।

মুসলিম বিশ্ব

ইসরাঈলি অবরোধে অপুষ্টিতে ভুগছে গাযার ৬০,০০০ শিশু

গত ৯ই এপ্রিল, বুধবার গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে আল-জাজিরা জানিয়েছে, গাযায় বর্তমানে প্রায় ৬০,০০০ শিশু 'অপুষ্টির কারণে চরম স্বাস্থ্য জটিলতার ঝুঁকিতে রয়েছে'। এদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইসরাঈলি বাহিনীর জারি করা বাস্তুচ্যুতির নির্দেশনার কারণে ২১টি পুষ্টিকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে ইতোমধ্যেই অপুষ্টিতে ভোগা প্রায় ৩৫০ শিশুর চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। এর আগে ফিলিস্তীনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস দাবি করে বলেছে, ইসরাঈল গাযায় গণহত্যামূলক আগ্রাসন ও শিশুদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালাচ্ছে। এ জন্য ইসরাঈলি নেতাদের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যমতে, এ নিয়ে গাযায় ইসরাঈলি আগ্রাসনে কমপক্ষে ৫০,৮১০ জন ফিলিস্তীনি নিহত ও ১,১৫,৬৮৮ জন আহত হয়েছে। তবে ফিলিস্তীনের সরকারি মিডিয়া অফিস নিখোঁজ থাকা

ফিলিস্তীনিদের সংখ্যা আপডেট করে মোট প্রাণহানির সংখ্যা ৬২,৭০০ জনেরও বেশি বলে জানিয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

পিঁপড়ারা কতটা বুদ্ধিমান!

ছোট পিঁপড়ার দল দেখতে দারুণ লাগে। সারিবদ্ধ ও দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায় পিঁপড়া। খুদে এই প্রাণী দিনরাত পরিশ্রম করে চলে। আর তাই তো যেখানেই মিষ্টি বা চিনিযুক্ত খাবার রাখুন না কেন, পিঁপড়া সেদিকে যাবেই। আপাতদৃষ্টে ক্ষুদ্র ও সাধারণ মনে হলেও পিঁপড়ার সমাজব্যবস্থা, যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করছে অনেক বছর ধরেই। পিঁপড়াকে মানুষের চেয়েও সামাজিক জীব বলা হয়ে থাকে। কারণ, কঠিন পরিশ্রমের পাশাপাশি সুসংগঠিত একটি কলোনিতে বাস করে পিঁপড়া। প্রতিটি কলোনিতে একটি 'রানি পিঁপড়া' থাকে। রানি পিঁপড়াকে ঘিরে গড়ে ওঠে একেকটি কলোনি। আর শ্রমিক পিঁপড়া খাবার সংগ্রহ, বাসা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণসহ বাচ্চার যত্ন করে। সৈনিক পিঁপড়া কলোনিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। শ্রম বিভাজনের মধ্য দিয়ে পিঁপড়ার কলোনিতে স্থিতিশীলতা দেখা যায়। পিঁপড়া একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফেরোমন নামের রাসায়নিক সংকেত ব্যবহার করে। খাবারের সন্ধান, বিপৎসংকেত বা কলোনির সদস্যদের মধ্যে বার্তা প্রেরণের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ফেরোমন নিঃসরণ করে। এই রাসায়নিক সংকেত এতটাই সুনির্দিষ্ট যে অন্যান্য পিঁপড়া সহজেই বার্তাটি বুঝতে পারে ও সেই অনুযায়ী কাজ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পিঁপড়ার এই রাসায়নিক যোগাযোগব্যবস্থা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ উন্নত রূপ। পিঁপড়া তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। খাবারের সন্ধানে যাওয়ার সময় বাধার সম্মুখীন হলে নতুন পথ তৈরি করার মতো কাজ খুব সহজে করতে পারে পিঁপড়ার দল। গবেষণায় দেখা গেছে, পিঁপড়ার স্মৃতিশক্তি বেশ উন্নত। তারা একবার খাদ্যের উৎসের সন্ধান পেলে সেই পথের তথ্য দীর্ঘ সময় মনে রাখতে পারে ও আবার সেখানে ফিরে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পিঁপড়ার মস্তিষ্কের গঠন ছোট হলেও তাদের নিউরনের সংযোগ অত্যন্ত কার্যকর। এর ফলে পিঁপড়া সহজেই শেখার পাশাপাশি মনে রাখতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব পরিবেশেই পিঁপড়ার অস্তিত্ব দেখা যায়। মরুভূমির তীব্র তাপ থেকে শুরু করে শীতল বনভূমির প্রতিকূল পরিবেশেও নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে পিঁপড়া। এই অভিযোজনক্ষমতা পিঁপড়ার বুদ্ধিমত্তার আরেকটি প্রমাণ বলে মনে করা হয়।

দাওয়াহ সংবাদ

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ: ব্যাচ নং- ২০ ও ২১

আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ১২ই এপ্রিল, ২০২৫ ইং শুরু হয়ে ১৭ই এপ্রিল, ২০২৫ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ২০তম এবং ১৯শে এপ্রিল, ২০২৫ ইং শুরু হয়ে ২৪শে এপ্রিল, ২০২৫ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ২১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কর্মশালাগুলোয় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, মাহবুবুর রহমান মাদানী, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, সায়েদ তাসনীম আল-আমান, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। ব্যাচ দুটিতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৪৬ জন ও ১৭ জন মক্তব শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাদ্বয়ের উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শিখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ও ছাহাবীদের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

প্রশ্ন (১): যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত কী?

-কুদ্দুস আলী
ময়মনসিংহ।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এমন কোনো দিন নেই, যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ তাআলার নিকট যিলহজ্জ মাসের এই ১০ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা বেশি প্রিয়’। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করাও কি (এত প্রিয়) নয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও তার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোনো লোক আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হয় এবং এ দুটির কোনোটিই নিয়ে যদি সে আর ফিরে না আসতে পারে, তাহলে তার কথা (অর্থাৎ সেই শহীদের মর্যাদা) আলাদা’ (আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৮, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, ‘যিলহজ্জ মাসের ১০ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোনো আমল আল্লাহর নিকট অধিক ভালো ও নেকীর নয়’ (বায়হাক্বী, হা/৩৪৭৬)।

হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (২): হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত কী কী?

-মাহবুব ইসলাম
মেহেরপুর।

উত্তর: হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ- ১. মুসলিম হওয়া (আত-তওবা, ৯/৫৪), ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (সুনানে আবী দাঊদ, হা/৪৪০৩), ৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া (সুনানে আবী দাঊদ, হা/৪৪০৩), ৪. আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা (আলে ইমরান, ৩/৯৭), ৫. স্বাধীন হওয়া (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১৫১০৫) এবং ৬. মহিলা হলে তার সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬২)।

প্রশ্ন (৩): আমার পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত জায়গাজমি ব্যতীত আমার আর কোনো সম্পদ নেই। সেগুলো চাষাবাদ করে আমি সংসার চালাই। এখন সেই সম্পদের কিছু অংশ বিক্রি করে আমার উপর হজ্জ করা ফরয হবে কি?

-আসলাম মিয়া
সুনামগঞ্জ।

উত্তর: কোনো ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু আছে, সবই তার সম্পদ। তা জমানো অর্থ হোক বা সম্পদের বিক্রয় মূল্য হোক। পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে অতিরিক্ত কোনো অর্থ যদি কোনো ব্যক্তির কাছে থাকে, যা দিয়ে সে হজ্জে আসা-যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির মালিকদের ক্ষেত্রে জমি বিক্রি করে হলেও হজ্জে যাওয়া ফরয। আল্লাহ বলেন, ‘আর আল্লাহর জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয করা হলো, যারা সেখানে যাবার সামর্থ্য রাখে’ (আলে ইমরান, ৩/৯৭)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বললেন, ‘হে লোকসকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হজ্জ পালন করো’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭)।

প্রশ্ন (৪): কোনো এক ব্যক্তি বলেছেন, হজ্জ করা মানে শুধু টাকা নষ্ট করা। এতে কোনো ফায়েদা নেই। অন্য দেশ ভ্রমণের মতোই এটাও একটা ভ্রমণ। আমার প্রশ্ন হলো, হজ্জে টাকা-পয়সা খরচ করলে নেকীর বিষয়ে কোনো স্পষ্ট আয়াত বা হাদীছ আছে কি?

-জুলফিকার
টাঙ্গাইল।

উত্তর: প্রথমত, সজ্ঞানে জেনেবুঝে দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে হাসিঠাট্টা বা উপহাস করা কুফরী। কোনো ব্যক্তি যদি এমন মন্তব্য করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘বলুন! তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান প্রকাশের পর কুফরী করেছ’ (আত-তাওবা, ৯/৬৫-৬৬)। হজ্জ কোনো আনন্দভ্রমণ বা টাকা-পয়সা অপচয় নয়; বরং তা শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত, যা সামর্থ্যবানদের উপর জীবনে একবার ফরয করা হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

তাঁর উমরার ব্যাপারে তাকে বলেছিলেন, ‘তোমার জন্য উমরাতে তোমরা কষ্ট ও টাকা-পয়সা খরচের সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে’ (হাকেম, ১/৬৪৪, হা/১৭৩৩, হাদীছ ছহীহ)। তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি হজ্জ-উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নিয়্যতে বের হবে, অতঃপর পথিমধ্যে মারা যাবে, তার জন্য গাযী, হাজী ও উমরাকারীর ছওয়াব লেখা হবে’ (বায়হাক্বী, হা/৩৮০৬)।

প্রশ্ন (৫): আমি শুনেছি, হজ্জ ও উমরা একসাথে করা যায়। এর নিয়ম কী? হজ্জ ও উমরা একসাথে করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই।

-পাঞ্জাব আলী
পাবনা।

উত্তর: হজ্জের মাঝে সবচেয়ে উত্তম হজ্জ হলো তামাত্তু হজ্জ। এতে একই সফরে হজ্জ ও উমরা পালন করা যায়। সেটা হলো, হজ্জ পালনকারী হজ্জের মাসগুলোতে উমরা এর ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করবে এবং উমরা শেষ করে ইহরাম থেকে হালাল হবে। তারপর হজ্জ করা পর্যন্ত হালাল অবস্থায়ই থাকবে। আর তার পক্ষে যেমন কুরবানী করা সম্ভব তেমন কুরবানী করবে। আর যদি একসাথে উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং হজ্জ ও উমরা শেষ করে যিলজ্জের ১০ তারিখে হালাল হয়, তাকে বলে কিরান হজ্জ। প্রথম পদ্ধতিতে হজ্জ করাই উত্তম ও হাজীদের জন্যও সুবিধাজনক। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তামাত্তু হজ্জ করার জন্য আদেশ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮, ৭২২৯)।

প্রশ্ন (৬): হজ্জে কোন কোন কাজ করতেই হবে? কোন কোন কাজ না করলে কাফফারা দিতে হবে?

-আশিকুর রহমান
উত্তরখান, ঢাকা।

উত্তর: হজ্জে যে কাজগুলো না করলে কাফফারা দিতে হয় সেগুলোকে ওয়াজিব বলে। হজ্জের ওয়াজিব আটটি। যথা- ১. নির্ধারিত মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা (ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৬), ২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থান করা (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮), ৩. মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা (আল-বাকারা, ২/১৯৮), ৪. তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা (ছহীহ মুসলিম, হা/১২৯৯), ৫. কুরবানী করা (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮), ৬. মাথা ন্যাড়া করা অথবা চুল ছোট করা (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৫৪), ৭. হজ্জের পরে তিনদিন অথবা দুইদিন মিনায় রাত্রিযাপন করা (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৪) এবং ৮. বিদায়ী তাওয়াফ করা (ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭০)।

প্রশ্ন (৭): বাংলাদেশের মীকাত কোনটি? বাড়ি অথবা হজ্জ ক্যাম্প থেকে বা ঢাকাতে বিমানে উঠার আগে বা যেকোনো স্থানে ইহরাম বাঁধা যাবে কি?

-মিনহাজ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: ইহরাম বাঁধার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসতে চাইলে এসব মীকাত অথবা তার বরাবর স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। বাড়ি বা হজ্জ ক্যাম্প থেকে বা অন্য কোনো স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা বৈধ হবে না। এভাবে ইহরাম বেঁধে হজ্জ করলে হজ্জ হবে না। বাংলাদেশের বিমানগুলোর জন্য মীকাত হলো ‘ইয়ালামলাম’, এটি মক্কা হতে ৭২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর যারা মীকাতের ভেতরে অবস্থান করে, তারা আপন স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে আর মক্কাবাসী নিজ বাড়ি হতে ইহরাম বাঁধবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৪)। তবে ইহরামের পোশাক সুবিধামতো যেকোনো স্থানে পরতে পারে। ইহরামের পোশাক পরা ও ইহরাম বাঁধা এক নয়।

প্রশ্ন (৮): ইহরাম বাঁধার পর থেকে কোন কোন কাজ করা যাবে না? জানার পরেও করলে করণীয় কী?

-আমান
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: ইহরাম বাঁধার পর হালাল হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যাবে না। যথা- ১. চুল বা লোম কাটা বা তুলে ফেলা (আল-বাকারা, ২/১৯৬), ২. নখ কাটা, ৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা (ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৬), ৪. পুরুষদের মাথা ও মুখ ঢাকা (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪২), ৫. পুরুষদের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪২)। এই পাঁচটি কাজ কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে করলে গুনাহগার হবে

এবং ফিদইয়া দিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যার কারণে করতে হলে গুনাহগার হবে না, তবে ফিদইয়া দিতে হবে (আল-বাকারা, ২/১৯৬)। ৬. স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা (আল-মায়েদা, ৫/১)। ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করলে কাফফারা দিতে হবে। ৭. বিবাহ করা এবং বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৬)। এমতাবস্থায় বিবাহ করলে সঠিক হবে না। ৮. স্বামী-স্ত্রী মিলন ও মিলন ছাড়া যৌনতৃপ্তি মিটানো (আল-বাকারা, ২/১৯৭)। ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী মিলন ঘটলে হজ্জ বাতিল হবে, কিন্তু হজ্জরত থাকতে হবে। আগামী বছর হজ্জ পালন করবে এবং দম দিতে হবে। (বিস্তারিত দেখুন- হজ্জ ও উমরা, পৃ. ৫৯-৬৬)।

প্রশ্ন (৯): ইহরাম বাঁধার পর নারীরা হাত মোজা এবং পা মোজা পরতে পারবে কি?

-রবিউল ইসলাম
কুমিল্লা।

উত্তর: মুহরিম অবস্থায় নারীরা হাত মোজা পরতে পারবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা পরবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮)। তবে পা মোজা পরাতে কোনো সমস্যা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা মুহরিম নারীর জন্য মোজার উপরের অংশ কেটে ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। পরে ছাফিয়্যাহ বিনতু আবূ উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন। এরপর তিনি তা কর্তন করা বাদ দেন (আবূ দাঊদ, হা/১৮৩১)। তবে ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মুখ ঢেকে রাখতেও পারে যেমনটি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা করতেন (আবূ দাঊদ, হা/১৮৩৩; বায়হাক্বী, হা/৯১২৩)।

প্রশ্ন (১০): হজ্জে বানানো কোনো দু'আ পড়া যাবে কি? হজ্জের দিন তাওয়াফ করে হোটেলে থাকা যাবে কি?

-হুমায়ুন
চট্টগ্রাম।

উত্তর: তালবিয়া, তাওয়াফ, সাঈ, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা ও পাথর নিক্ষেপের সময় মাসনূন দু'আ ব্যতীত মানুষের বানানো কোনো দু'আ পড়া যাবে না। বরং কুরআন হাদীছে উল্লিখিত দু'আসমূহই পড়তে হবে আর হজ্জের দিন তাওয়াফ, সাঈ শেষ করে হোটেলে অবস্থান করা যাবে না। মিনায় ফিরে যেতে হবে।

প্রশ্ন (১১): মুআল্লিমের কথায় হজ্জের কাজগুলো আগে পিছে করা বা জরিমানা দেওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: তাওয়াফ, সাঈর কাজগুলো আগে বা পরে করে নেওয়া যাবে মর্মে মুআল্লিমের কোনো কথা গ্রহণ হবে না। আর মুআল্লিমের কথার উপর ভিত্তি করে সন্দেহের উপর কোনো দম বা জরিমানা দেওয়া বিদআত।

প্রশ্ন (১২): হজ্জের সঠিক তালবিয়া সম্পর্কে জানাবেন। তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে কি অল্প কমবেশি করে বলা যাবে?

-আহমেদ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর: সঠিক তালবিয়া হলো- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ **উচ্চারণ:** *লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।* **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি উপস্থিত। আপনার কোনো শরীক নেই। আমি আপনার ডাকে উপস্থিত। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আপনার। সমস্ত অনুগ্রহ আপনার, রাজত্ব আপনার, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা একটু বাড়িয়ে বলতেন, لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بيديك لبيك. والرغباء إليك والعمل। উক্ত তালবিয়ায় হজ্জে পড়তে হবে। মনগড়া নিজস্ব বানানো বিদআতী তালবিয়া পড়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, সমস্বরে মিলিত কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৩): আরাফার মাঠে উপস্থিত থাকাই হজ্জ। কখন সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে? এখন কোনো কারণবশত উপস্থিত হতে না পারলে বা দেরিতে উপস্থিত হলে হজ্জ হবে কি? বা তাকে কোনো কাফফারা দিতে হবে কি?

-কামরুল হাসান
ঢাকা।

উত্তর: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আরাফাতে অবস্থান করা হচ্ছে হজ্জ'। অতএব, যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজর ছালাতের পূর্বেই আরাফাতে এসে পৌঁছল তার হজ্জ পূর্ণ হলো (ইবনু মাজাহ, হা/৩০১৫)। যথাসময়ে আরাফার মাঠে উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো কারণবশত যথাসময়ে আরাফার মাঠে উপস্থিত হতে না পারলে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো মুহূর্তে অবস্থান করতে পারলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে, যা অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের আগে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে তার হজ্জ হবে না। তাকে সামনে বছর আবার হজ্জ করতে হবে। কেননা আরাফায় অবস্থানই হজ্জ (তিরমিযী, হা/৯০৪)।

প্রশ্ন (১৪): আরাফার দিন অনেকে 'জাবালে রহমতে' উঠে দু'আ করে। সেখানে উঠার বা সেখানে উঠে দু'আ করার কোনো বিশেষ ফযীলত কুরআন-হাদীছে আছে কি?

-আলালুদ্দীন
ঢাকা।

উত্তর: গারে হেরা, গারে ছওর বা জাবালে রহমতে অথবা হজ্জ পালনের কোনো স্থানে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ছালাত আদায় করা বা দু'আ করা বিদআত। 'জাবালে রহমতে' উঠা বা সেখানে উঠে দু'আ করার আলাদা কোনো ফযীলত কুরআন-হাদীছে নেই। বরং আরাফার যেকোনো স্থান হতে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আরাফার সম্পূর্ণ স্থানই অবস্থানস্থল' (আবূ দাঊদ, হা/১৯৩৭)।

প্রশ্ন (১৫): আরাফায় কোন কোন কাজ করা যাবে না?

-আব্দুর রহীম
নওগাঁ।

উত্তর: আরাফায় অবস্থানকালে বেশি বেশি দু'আ, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার করতে হবে ও তালবিয়া পাঠ করতে হবে। নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যাবে না- (১) আরাফার জন্য বিশেষভাবে গোসল করা, (২) বিভিন্ন তরীকার অযীফা ও বানোয়াট দু'আ-দরূদ পাঠ করা, (৩) জাবালে রহমতে উঠা, পাথরে চুমু খাওয়া ও চেহারায় মালিশ করা, (৪) জাবালে রহমতে তাওয়াফ করা ও ছবি তোলা বা সেখানে কিছু লিখা, (৫) খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে ছালাত আদায় করা, (৬) যোহর-আছর ছালাত একসাথে আদায় না করে নির্ধারিত সময়ে ভিন্নভাবে আদায় করা, (৭) যোহর-আছরের সুন্নাত বা অন্য কোনো নফল ছালাত আদায় করা, (৮) অনর্থক গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া, (৯) বিশেষ পদ্ধতিতে মীলাদ ও যিকির করা, (১০) সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা, (১১) আরাফার সীমানার বাইরে ঘোরাফেরা করা, ১২. যোহর ও আছরের ছালাত চার রাকআত আদায় করা (বিস্তারিত দেখুন- হজ্জ ও উমরা, পৃ. ১০৭)।

প্রশ্ন (১৬): হজ্জের ১০ তারিখের মূল কাজগুলো কী কী? সেগুলো আগে পিছে হয়ে গেলে কি দম দিতে হবে?

-আয়েশা
কুষ্টিয়া।

উত্তর: ১০ যিলহজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছে মোট পাঁচটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। সেগুলো হলো- (১) বড় জামরায় কঙ্কর মারা, (২) কুরবানী করা, (৩) মাথা ন্যাড়া করা অথবা চুল ছোট করা, (৪) মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাযা করা, (৫) সাঈ করা এবং (৬) মিনায় ফিরে আসা। তবে এ কাজগুলোর কোনোটা আগে-পিছে হয়ে গেলে তাতে কোনো দোষ নেই। দম দেওয়া লাগবে না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিবসে মিনায় লোকদের সম্মুখে (বাহনের উপর) দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁকে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি ভুলক্রমে কুরবানীর পূর্বেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'যবেহ করো, কোনো ক্ষতি নেই'। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলক্রমে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'কঙ্কর ছুঁড়ো, কোনো অসুবিধা নেই'। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন পূর্বে বা পরে করা যে কোনো কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হচ্ছিলেন, তিনি এ কথাই বলেছিলেন, 'করো, কোনো সমস্যা নেই' (ছহীহ বুখারী, হা/৮৩)।

প্রশ্ন (১৭): হজ্জে কুরবানী করতে না পারলে হজ্জে তিন দিন ও বাড়িতে সাত দিন মোট ১০ দিন ছিয়াম পালন করবে। হজ্জে কীভাবে তিনদিন ছিয়াম রাখবে? না রাখতে পারলে তাশরীকের দিন রাখতে পারবে কি-না?

-আহনাফ
দিনাজপুর।

উত্তর: ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কুরবানীর সামর্থ্য রাখে না সে হজ্জের দিনসমূহের মধ্যে তিনদিন ছওম পালন করবে আর তা আরাফার দিনের আগে হতে হবে। আর তিনদিনের শেষ দিন যদি আরাফার দিন হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫২১)। তাতেও রাখতে না পারলে তাশরীকের দিনগুলোতে রাখবে। আয়েশা ও ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, যার নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে ছওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯৭)।

প্রশ্ন (১৮): হজ্জে কেন পাথর নিক্ষেপ করা হয়? এতে কোনো হিকমত আছে কি?

-নুর হোসাইন
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: পাথর মারা আল্লাহর বিধান ও হজ্জের কাজগুলোর মধ্যে একটি, যা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রচলন করেছিলেন। তার নীতির অনুসরণে পাথর মারা হয়। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন হজ্জের নিয়মাবলি পালন করতে আসলেন, তখন শয়তান প্রথম জামরার নিকটে তার সামনে আসল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে গেল। শয়তান আবারো দ্বিতীয় জামরার নিকটে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সামনে আসল। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে গেল। শয়তান আবারো তৃতীয় জামরার নিকটে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সামনে আসল। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে গেল'। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর নীতির অনুসরণ করো (শুআবুল ঈমান, হা/৫০৬)। এছাড়া পাথর মারাতে ফযীলত রয়েছে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি জামরায় যে পাথর নিক্ষেপ করবে সেটি তোমার জন্য কিয়ামতের দিন আলো হয়ে আসবে' (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৫৫৭)। আরেক বর্ণনায় আছে, 'প্রত্যেক পাথর নিক্ষেপ বড় পাপের জন্য কাফফারাস্বরূপ' (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১১১২)।

প্রশ্ন (১৯): পাথর মারার ক্ষেত্রে রাতে পাথর মারা যায় কি? কোনো কারণে একদিন পাথর মারতে না পারলে পরেরদিন কাযা করা যাবে কি?

-তুহিন সরদার
টাঙ্গাইল।

উত্তর: হজ্জের ১০ তারিখ পাথর মারতে হবে সূর্য উঠার পরে আর পরের দিনগুলোতে পাথর মারার সময় হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে মাগরিব পর্যন্ত। সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মারলে তাকে পুনরায় পাথর মারতে হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে রাতে পাথর মারতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাখালরা রাতে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং দিনে পশু-প্রাণী চরাবে (সিলসিলা ছহীহা, হা/২৪৭৭)। পাথর মারা ছেড়ে দিলে তাকে দম দিতে হবে। পরেরদিন কাযা করা যাবে না।

প্রশ্ন (২০): হজ্জে কুরবানী কোন জায়গায় করতে হবে এবং কতদিন পর্যন্ত কুরবানী করা যাবে?

-মোস্তাক আহমাদ
পাবনা।

উত্তর: সম্পূর্ণ মিনা ও মক্কার প্রতিটি পথ পশু যবেহ করার স্থান। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মিনা সম্পূর্ণটাই কুরবানীর স্থান। মক্কার প্রতিটি পথ মানুষ চলাচলের জন্য এবং কুরবানী করার জন্য। পূর্ণ আরাফা অবস্থানের জন্য এবং পুরো মুযদালিফা অবস্থানের জন্য' (ইবনু মাজাহ, হা/৩০৪৮)। অর্থাৎ মক্কার হারাম এলাকার যে কোনো স্থানে যবেহ করলেই হয়ে যাবে। আর ১০ তারিখে এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে মোট চারদিনের যেকোনো দিনে কুরবানী করা যায় (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯৮)।

প্রশ্ন (২১): এক বক্তা বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ সাদা ছিল। পরে দুনিয়াতে এসে মানুষের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে। এ কথার কি কোনো দলীল আছে?

-মাসুম
রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য সঠিক। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'জান্নাত হতে হাজারে আসওয়াদ অবতীর্ণ হয়েছিল দুধের থেকেও বেশি সাদা অবস্থায়। কিন্তু আদম সন্তানের পাপ এটিকে কালো করে দিয়েছে' (তিরমিযী, হা/৮৭৭)।

প্রশ্ন (২২): হাজারে আসওয়াদে কীভাবে ইশারা করব? আর তাওয়াফের সময় গল্প করা যাবে কি?

-বুলবুল মিয়া
কুষ্টিয়া।

উত্তর: হাজারে আসওয়াদে ইশারা করার সময় দুই হাত উঠিয়ে ইশারা করা হবে না। বরং এক হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে ইশারা করতে হবে। এ সময় হাতে চুম্বন দেওয়া যাবে না। আর তাওয়াফের সময় স্ত্রী, বন্ধু বা কোনো ব্যক্তির সাথে গল্পে জড়ানো যাবে না এবং সেলফি তোলা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাওয়াফকে ছালাত বলেছেন। তবে কল্যাণপূর্ণ কোনো কথা বলতে পারে (মুসনাদে দারেমী, হা/১৮৮৯; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১২৮০৮)।

প্রশ্ন (২৩): তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন দেওয়া যাবে কি? আর উমরার তাওয়াফে রমল ও ইজতেবার বিধান কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন দেওয়া যাবে না, তবে স্পর্শ করা ভালো। আর উমরার তাওয়াফে রমল ও ইজতেবা করতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৬০৩)। রমল হলো ধীরপদে বীরবেশে দ্রুত চলা। রমল শুধু তাওয়াফে কুদূমে ও প্রথম তিন চক্করেই করতে হবে।

প্রশ্ন (২৪): হারামে ছালাতের নিষিদ্ধ সময় আছে কি?

-আশিক রহমান
গাজীপুর।

উত্তর: হারামে ২৪ ঘণ্টা ছালাত ও তাওয়াফ চলবে। কোনো নিষিদ্ধ সময় নেই। যুবায়ের ইবনু মুত্বইম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা কাউকে রাত বা দিনের যেকোনো সময়ে এই ঘরে তাওয়াফ করতে ও ছালাত আদায় করতে বাঁধা দিবে না' (আবূ দাঊদ, হা/১৮৯৪)।

প্রশ্ন (২৫): কোন কোন কারণে হজ্জ হয় না বা বাতিল হয়ে যায়?

-মুশফিক
ঠাঁকুরগাও।

উত্তর: হজ্জের কোনো রুকন ছুটে গেলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। হজ্জের রুকন চারটি। যথা- ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফায় অবস্থান করা, ৩. তাওয়াফে ইফাযা করা এবং ৪. সাঈ করা। এছাড়া ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন হলে হজ্জ বাতিল হয়ে যায়। তবে তাকে হজ্জরত অবস্থায় থাকতে হবে এবং পরের বছর হজ্জ পালন করতে হবে (মুসতাদরাক হাকেম, হা/২৩৭৫)।

প্রশ্ন (২৬): কোনো ভুলের কারণে হজ্জে দম দিতে হলে দমের গোশত নিজে খেতে পারবে কি?

-আহসান হাবীব
রাজশাহী।

উত্তর: এমন দমের গোশত ফকীর-মিসকীনদের দিয়ে দিতে হবে। দমদাতা এর গোশত খেতে পারবে না। কা'ব ইবনু উজরাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোনো অসুখ হবে এবং এ কারণে সে মাথা মুড়িয়ে ফেলে, তবে তাকে ফিদইয়া হিসেবে ছওম পালন করতে হবে অথবা ছাদাকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে' (আল-বাকারা, ২/১৯৬)। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলাম এবং তিনি বললেন, 'আরও নিকটে এসো'। অতএব, আমি নিকটবর্তী হলাম এবং তিনি বললেন, 'পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?' ইবনু আওন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে ছওম অথবা ছাদাকা করতে বললেন ছয়জন মিসকীনের মাঝে এক ফারাক (তিন ছা') পরিমাণ অথবা সহজলভ্য হলে কুরবানীর মাধ্যমে ফিদইয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১২০১)।

প্রশ্ন (২৭): মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাতে উপস্থিত হতেই হবে, এমন মনে করা যাবে কি? হজ্জে বেশি কুরআন পড়ব নাকি তাওয়াফ করব?

-ইসমাইল
রাজশাহী।

উত্তর: হারামে জামাআতে উপস্থিত হওয়াকে প্রয়োজন মনে না করে মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাতে উপস্থিত হতেই হবে এমনটি মনে করা বিদআত। কেননা এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়নি। আর হজ্জ-উমরা সফরে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা ভালো। তবে সর্বোত্তম হলো শরীরের গতি অনুযায়ী দিন-রাত তাওয়াফ করা ও নফল ছালাত আদায় করা।

প্রশ্ন (২৮): 'যে আমার কবর যিয়ারত করবে, আমার শাফাআত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে'। উক্ত হাদীছের প্রতি আমলের জন্য মদীনায় গমনের বিধান কী?

-মোতাহার
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: উক্ত বর্ণনাটি মাওযূ বা জাল। হাদীছটির দুটি সনদ রয়েছে। দুটিই যঈফ। হাদীছটি হলো, مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (যঈফ আল জামে‘, হা/৫৬০৭; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১০৮১)। সুতরাং এর প্রতি আমলের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৯): রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কবর যিয়ারতের জন্য মদীনায় যাওয়া যাবে কি? সেখানে হাত তুলে দু‘আ করা বা কিছু চাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ হাসান
চট্টগ্রাম।

উত্তর: শুধু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কবর যিয়ারতের জন্য মদীনায় গমন করা যাবে না। তবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনায় যেতে পারে। আবূ সাইদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া নেকীর আশায় অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্বছা ও মসজিদে নববী' (ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৯)। আর সেখানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে কিছু চাওয়া বা হাত তুলে দু‘আ করা যাবে না। কেননা তা শিরক। কোনো কিছু চাইতে হলে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।

প্রশ্ন (৩০): তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ কী? এটি কখন করতে হবে?

-ইয়ামিন
যশোর।

উত্তর: যখন মানুষের হজ্জের কাজ শেষ হবে ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সে তাওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ত্যাগ করবে। এটাকে বলা হয় তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হজ্জ শেষে মানুষ বিভিন্ন পথে বাড়ি ফিরতে লাগল, তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কা‘বায় সব শেষে তাওয়াফ না করে কেউ যেন বাড়ি না ফিরে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৪)। উল্লেখ্য, এই তাওয়াফ মক্কায় বসবাসকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন (৩১): হজ্জ করতে গিয়ে মারা গেলে কি সাধারণ মৃতের মতোই কাফন-দাফন করে তাকে দাফন করতে হবে?

-ওয়াহিদ আলী
রংপুর।

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তাকে গোসল দিতে হবে, ইহরামের কাপড় দিয়েই কাফন দিতে হবে, সুগন্ধি দেওয়া যাবে না, মাথা খোলা রাখতে হবে। আরাফার মাঠে জনৈক ছাহাবী ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা তাকে বরই পাতা ও পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে দুটি কাপড়ে অর্থাৎ ইহরামের দুটি কাপড়ে কাফন পরাও, তাকে সুগন্ধি লাগিয়ো না এবং মাথা ঢেকে দিয়ো না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১২০৬)।

প্রশ্ন (৩২): হজ্জে গিয়ে অনেককে দেখা যায়, তারা হজ্জে গিয়ে ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে। হজ্জে গিয়ে কি ব্যবসা করা বৈধ?

-আসলাম মন্ডল
নওগাঁ।

উত্তর: হজ্জ করতে গিয়ে সেখানে ব্যবসা করা জায়েয। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোনো দোষ নেই (আল-বাকারা, ২/১৯৮)। এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা বলেন, ইহরাম করার পূর্বে কিংবা ইহরাম করার পরে ক্রয়বিক্রয় করাতে কোনো আপত্তি নেই (তাফসীরে তাবারী, ৪/১৬৩)। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য যেন হজ্জের কার্যাবলিতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

প্রশ্ন (৩৩): যমযমের পানি বাংলাদেশে নিয়ে এসে বিক্রি করা যাবে কি? করলে কি পাপ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কল্যাণের আশায় সম্ভব হলে যমযমের পানি নিয়ে আসা যেতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাত্রে এবং মশকে যমযমের পানি বহন করতেন। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর যমযমের পানি ঢালতেন এবং তাদের পান করাতেন (সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৮৩)। তবে কিছু উপার্জনের আশায় বিক্রির উদ্দেশ্যে যমযমের পানি আনা বা বিক্রি করা বৈধ হবে না।

কুরবানী ও ঈদ

প্রশ্ন (৩৪): আমরা কি সঊদী আরবের সাথে মিল রেখে আরাফার ছিয়াম রাখবে নাকি নিজ দেশের হিসাবে?

-কামরুল ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর: আরাফার ছিয়াম পালন করতে হয় যেদিন হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করেন। আর সেটা হয় যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে। সুতরাং যেদিন যে দেশে ৯ যিলহজ্জ হবে সেদিন সে দেশে আরাফার ছিয়াম পালন করবে, সঊদীর সাথে মিল রেখে নয় (ফাতাওয়া ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফতওয়া নং ৪০৭২০; ইসলাম ওয়েব, ফতওয়া নং ২২৭৯৫৩)। কারণ ছিয়াম ও ঈদের বিধান চাঁদ দেখার সাথে সম্পর্কিত, স্থানের সাথে নয় (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮০; মিশকাত, হা/১৯৭০)। আর এটাই দলীলের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। তবে সঊদী আরবের আরাফার দিনে ছিয়াম রাখার পক্ষে শায়খ বিন বাযসহ কয়েকজন বিদ্বানের ফতওয়া আছে। বিধায় কেউ চাইলে সঊদী আরবের সাথে মিল রেখেও আরাফার ছিয়াম রাখতে পারে। (ওয়াল্লাহু আ‘লাম)।

প্রশ্ন (৩৫): ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করা যাবে কি?

-পিয়াস মাহমুদ
জামালপুর

উত্তর: ঈদের মাঠে ছালাত শেষে কোলাকুলি করার বিষয়ে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ‘তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা’। অর্থাৎ ‘আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন! (তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪)। পরস্পর সাক্ষাৎ হলে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন (আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৯৭)।

প্রশ্ন (৩৬): ঈদের দিন বাবা-মায়ের কবর যিয়ারতের বিধান কী?

-মাহবুব আলম
নওগাঁ।

উত্তর: কবর যিযারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করাবে’ (ছহীহুল জামে, হা/৩৫৭৭)। তবে কবর যিযারত করার জন্য জুমআ ও দুই ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বিদআত হবে। কেননা এই দুই দিনে খাছ করে দু‘আ করার পক্ষে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যা শরীআতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তবে যেকোনো দিনে, যেকোনো সময়ে কবর যিয়ারত করা যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৫৫; মিশকাত, হা/১৭৬৭)।

প্রশ্ন (৩৭): কুরবানীর হুকুম কী? সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানী না দিলে কি পাপী হবে?

-মাসুম
সাতক্ষীরা।

উত্তর: কুরবানী দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের ওপর প্রতি বছর কুরবানী করা কর্তব্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; তিরমিযী, হা/১৫১৮)। তবে সামর্থ্য থাকার পরেও কেউ কুরবানী না করলে সে পাপী হবে না। আবূ সারীহা (অর্থাৎ হুযায়ফা ইবনু উসাইদ আল-গিফারী) রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝে মাঝে কুরবানী দিতেন না, লোকেরা তাদের অনুসরণ করে কুরবানী দেওয়া জরুরী মনে করবে তাই' (বায়হাক্বী, ৯/২৯৫; ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫৫)। আবূ মাসঊদ আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, সামর্থ্য থাকার পরেও আমি কুরবানী দেয় না এই আশঙ্কায় যে, আমার প্রতিবেশীগণ হয়তো মনে করবে কুরবানী দেওয়া আমার জন্য জরুরী' (ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫৫ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩৮): ছাগলের একটি জাত আছে যাদের শিং কোনো বয়সেই বের হয় না। এসব ছাগল কি কুরবানী দেওয়া যাবে?

-মো. শামসুদ্দিন
শীতল মাঠ, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর: শিংওয়ালা পশুই কুরবানী করা উত্তম। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি সাদা কালো রঙের শিংওয়ালা ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাত দিয়ে সে দুটিকে যবেহ করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৫৪)। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে শিংবিহীন পশু কুরবানী করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৯): কুরবানীর পশু কেমন হতে হবে? কী কী বিষয় লক্ষ্য রেখে কুরবানী ক্রয় করব?

-আকমাল
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো- ১. দুধ দাঁত পড়ে নুতন দাঁত উঠা (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৩)। ২. চারটি দোষ থেকে মুক্ত হওয়া- ক. স্পষ্ট কানা হওয়া, খ. স্পষ্ট রোগী হওয়া, যেমন- চুলকানি-পাচড়া বা অন্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, গ. স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া এবং এমন অচল হওয়া যা চলতে পারে না। ঘ. এমন দুর্বল হওয়া যার শরীরে কোনো মাংস নেই (ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪৪)। ৩. চোখ ও কান ভালোভাবে দেখে নেওয়া। আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন কুরবানীর প্রাণীর চোখ-কান ভালোভাবে দেখে নেই (আবূ দাঊদ, হা/২৮০৪)।

প্রশ্ন (৪০): ক্রয়ের সময় গর্ভবতী পশু জানা ছিল না। জানার পর কি তা দিয়ে কুরবানী করা যাবে?

-শামসুল আলম
ঢাকা।

উত্তর: হ্যাঁ, যাবে। এতে শারঈ কোনো বাধা নেই। যবেহ করার পর তার পেটের বাচ্চাটি যদি জীবিত পাওয়া যায় তাহলে রুচি হলে সেটাও যবেহ করে খাওয়া যেতে পারে। এমনকি মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে তার মায়ের যবেহ বাচ্চার যবেহ বলে গণ্য হবে। আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে তাও খেতে পার'। মুসাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনায় রয়েছে, আমরা বলি, হে আল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা উষ্ট্রী, গাভী ও বকরী যবেহ করার পর কখনো এর পেটে ভ্রূণ পেয়ে থাকি। আমরা এ ভ্রূণ ফেলে দিব নাকি খাব? তিনি বললেন, 'ইচ্ছা হলে খেতে পার। কেননা মাকে যবেহ করাই এর যবেহের অন্তর্ভুক্ত' (আবূ দাঊদ, হা/২৮২৭)।

প্রশ্ন (৪১): কুরবানীর পশু কোথায় যবেহ করব?

-আব্দুস সালাম
রাজশাহী।

উত্তর: কুরবানীর পশু ঈদগাহে যবেহ করাই উত্তম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে কুরবানী করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৫২)। তবে ঈদগাহ ব্যতীত অন্যত্রও কুরবানী করা যায়।

প্রশ্ন (৪২): মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা কি জায়েয? এতে কি তারা ছওয়াব পাবে?

-বশির
রাজশাহী।

উত্তর: মূলত কুরবানীর বিধান কেবল জীবিত ব্যক্তির জন্য। তাই মৃত্যুর পূর্বে মৃত ব্যক্তি যদি অছিয়ত করে না যায় বা নযর মেনে না থাকে, তাহলে পৃথকভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীর সপক্ষে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। কেননা এটি একটি ইবাদত। আর ইবাদত দলীল ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে করা যায় না (আজালাতুল মুহতাজ ইলা তাওজিহিল মিনহাজ, ৪/১৭৪৩)।

প্রশ্ন (৪৩): আমরা তিনভাই মিলে একটি গরু কুরবানী দেই। এক হুজুর বলেছেন, আমাদের কুরবানী হবে না। প্রত্যেককে আলাদাভাবে একটা করে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের এমন সামর্থ্য নেই। এমতাবস্থায় আমাদের কুরবানী কি কবুল হয় না?

-বকুল
কুষ্টিয়া।

উত্তর: প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী হতে হবে এটাই সুন্নাত। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে লোকসকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী দেওয়া কর্তব্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; মিশকাত, হা/১৪৭৮)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দুটি দুম্বা কুরবানী করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৪)। তবে এক গরুতে বা উটে সাত বা দশজন ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে; পারিবারিকভাবে নয়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছি (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮; আবূ দাঊদ, হা/২৮০৯)।

প্রশ্ন (৪৪): আমার জন্মের সাত দিনে আকীকা করা হয়নি। তাই পরিবার থেকে বলছে, এবছর কুরবানীর গরু দিয়ে আমার আকীকা দিবে। এভাবে কুরবানীর পশুতে আকীকা হবে কি?

-কারিমুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: প্রথমত, সাতদিনে আকীকা করা না হলে পরবর্তীতে আকীকা করার প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিনে আকীকা করতে বলেছেন (আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৯)। দ্বিতীয়ত, গরু দিয়ে আকীকা হয় না; আকীকা ছাগল দিয়ে করতে হয় (আবূ দাঊদ, হা/ ২৮৩৪)। তৃতীয়ত, কুরবানীর পশুতে আকীকা হবে না। কেননা কুরবানী ও আকীকা আলাদা দুটি বিধান এবং উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন (তুহফাতুল মুহতাজ শারহুল মিনহাজ, ৯/৩৭১)।

প্রশ্ন (৪৫): কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় অনেকে পশু যবেহ করার পরপরই পায়ের রগগুলো কেটে দেয়। এটা করা যাবে কি?

-মুনশেব
দিনাজপুর।

উত্তর: না, এভাবে পশুকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। যবেহ করার পর নীরব হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া যবেহ করার সময়ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। শাদ্দাদ ইবনু আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ অপরিহার্য করেছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করো, তা উত্তম পন্থায় করো। আর যখন যবেহ করো, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ চাকু ধারালো করে নেয় এবং নিজের যবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩১৭০)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি ধার দিতে বলেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭)।

প্রশ্ন (৪৬): কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় কী বলতে হবে? কার পক্ষ থেকে তা বলা যাবে কি?

-হাকিম সরদার
নীলফামারী।

উত্তর: কুরবানীর পশু যবেহ করতে হবে 'বিসমিল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' বলে। হাদীছে এসেছে, তিনি ভেড়া দুটির ঘাড়ে তাঁর পা রেখে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে স্বহস্তে সেই দুটিকে যবেহ করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৫)। এছাড়া যার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হবে তার নামও উল্লেখ করতে পারে যেমনটি রাসূল করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদ, ও আলে মুহাম্মাদ ও উম্মাতি মুহাম্মাদ' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৯২)।

প্রশ্ন (৪৭): কুরবানীর গোশত বিক্রি করা যাবে কি? অনেকে মানুষের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে আসার পর আবার তা বিক্রি করে।

-মুনতাজ মুনির
ঢাকা।

উত্তর: যে ব্যক্তি চেয়ে নিয়ে এসেছে তার জন্য উত্তম হলো খাওয়া। তবে রাখার জন্য জায়গা না থাকলে বা নিজে নিঃস্ব হলে, তখন বিক্রি করতে পারে। তবে কুরবানীদাতা বিক্রি করতে পারবে না। আলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী তাকে তার কুরবানীর পশুর দেখাশুনা করতে, এদের গোশত, চামড়া ও পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে এবং তা হতে কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু না দিতে নির্দেশ দেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৭)। অতএব, কুরবানীদাতার জন্য কুরবানীর গোশত বিক্রয় করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৪৮): কাজের লোকদের কি কুরবানীর গোশত দেওয়া যাবে? উল্লেখ্য, তারা কুরবানী দেওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় সবকিছু করে।

-মিনহাজ
ঢাকা।

উত্তর: কাজের লোককে পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানীর গোশত দেওয়া যাবে না। পারিশ্রমিক আলাদা দিতে হবে। আর তারা কুরবানীর গোশত পাওয়ার হক্বদার হলে হক্বদার হিসাবে অথবা হাদিয়া হিসাবে কিছু দেওয়া যেতে পারে। আলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী তাকে তার কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে, এদের গোশত, চামড়া ও পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে এবং তা হতে কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু না দিতে নির্দেশ দেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৭)।

প্রশ্ন (৪৯): কুরবানীর ঈদের দিন যারা কুরবানী করবেন তাদের কুরবানীর গোশত রান্না করেই কি খেতে হবে নাকি আগেও খাওয়া যায়?

-মোস্তাকিম
বগুড়া।

উত্তর: কুরবানীর ঈদে সকাল থেকে কিছু না খেয়ে ঈদের ছালাত শেষ করে এসে খাবার খাওয়া সুন্নাত। বুরায়দা বলেন, রাসূল ঈদুল ফিতরের দিন না খেয়ে বের হতেন না আর ঈদুল আযহার দিনে ছালাতের পূর্বে কিছু খেতেন না, ছালাত থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোশত খেতেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৯৮৪)।

প্রশ্ন (৫০): কুরবানীর গোশত কাউকে না দিয়ে ফ্রিজে রেখে পরিবারকে খাওয়ানো যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কুরবানীর গোশত অসহায় মানুষকে বা আত্মীয়-স্বজনকে না দিয়ে একাই খেলে গুনাহগার হবে। কেননা আল্লাহ আদেশ করেন, '... তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন ও ফকীরকে খাওয়াও' (আল-হাজ্জ, ২২/৩৬)। তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও' (আল-হাজ্জ, ২২/২৮)। রাসূল কুরবানীর গোশতের ব্যাপারে বলেন, 'তোমরা খাও, জমা রাখো এবং দান করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১)। তবে এরকম কোনো মানুষ না থাকলে ফ্রিজে রেখে দীর্ঘদিন ধরে খেতে পারে।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

(৭) ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বাতিল করার প্রস্তাব’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ৩৫)*। —সংবিধানের ২-এর ক ধারা বাতিলের প্রস্তাবনার মাধ্যমে তারা অযাচিত হস্তক্ষেপ করেছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

(৮) ‘শরীর আমার, সিদ্ধান্ত আমার’ *(প্রতিবেদন, পৃ. ১০৫)*। —নারীদের স্বেচ্ছাচারী জীবনের প্রচারণা চালানোর এমন প্রস্তাব ইসলামি নীতিবোধ ও সমাজের নৈতিকতার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

(৯) ‘Comprehensive Sexuality Education’ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব। —স্কুল পর্যায়ে বিকৃত যৌন শিক্ষা চালুর প্রস্তাবনা সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(১০) Gender Identity Theory-এর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে পরিচয় সংকট সৃষ্টি করা এবং LGBTQ+ বিষয়ক প্রপাগান্ডা চালু করার অপচেষ্টাও প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে রয়েছে। অথচ, জেনেটিক বিজ্ঞান অনুযায়ী পুরুষ ও নারী হওয়া একটি জৈবিক সত্য। এই মতবাদ পশ্চিমা সমাজে চালু হওয়ার পর কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পেয়েছে *(Trevor Project, 2022)*। WHO ও APA গবেষণায় দেখা গেছে, সমকামীদের মধ্যে PTSD, মাদকাসক্তি ও আত্মহত্যার হার দ্বিগুণ। HIV সংক্রমণ সমকামীদের মধ্যে ২৬-২৮ গুণ বেশি *(Farley et al., WHO, UNAIDS)*।

নারী সংস্কার কমিশনের এই প্রস্তাবনাগুলোকে সংস্কার না বলে বরং সমাজবিধ্বংসী ও মূল্যবোধবিরোধী ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে। আমরা সরকার মহোদয়ের নিকট দাবি জানিয়ে বলতে চাই— ১. বিদ্যমান সংস্কার কমিশন অবিলম্বে বাতিল করে ইসলামিক স্কলার ও মূলধারার নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নতুন কমিশন গঠন। ২. শিক্ষাক্রম থেকে বিকৃত যৌনতা ও জেন্ডার থিওরি সম্পূর্ণ অপসারণ। ৩. LGBTQ+ প্রপাগান্ডা রোধে কার্যকর আইন প্রণয়ন। ৪. ইসলামী পারিবারিক আইন সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন। ৫. পতিতাবৃত্তি ও ব্যভিচারকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা। ৬. ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নারীর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি। ৭. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষার্থে জাতীয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিষদ গঠন।

আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলছি, ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা নারীর যথাযথ সম্মান, অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। আমরা নারীর সম্মান চাই—পতিতাবৃত্তির নামে লাঞ্ছনা নয়। আমরা অধিকার চাই—চারিত্রিক বিকৃতির নামে ধ্বংস নয়। আমরা স্বাধীনতা চাই—আত্মা, পরিবার ও সমাজ বিধ্বংসী পাশ্চাত্য অন্ধ অনুকরণ নয়। আমরা আইন চাই—যা ঈমান, বাস্তবতা ও সুবিচারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। *(প্র. স.)*

আনাস হোমিও এন্ড হিজামা কেয়ার
মো: মনিরুল ইসলাম হোমিও চিকিৎসক ও হিজামা থেরাপিস্ট, ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
চিকিৎসা সেবাসমূহ
- বিনা অপারেশনে নাকের পলিপাস
- বিনা অপারেশনে পাইলস, টনসিল ও টিউমার
- বিনা অপারেশনে গ্যাস্টিক ও পেপটিক আলসার
- বিনা অপারেশনে কিডনীর পাথর ও মুত্রথলীর পাথর
- এছাড়াও এলার্জি, চর্ম ও যৌন, শ্বাসকষ্ট, এবং মহিলাদের অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়
- বিনা অপারেশনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস
- প্রসাবের ইনফেকশন
- হাঁটু, কোমরের, জয়েন্টের, হাঁড় ক্ষয় ও বৃদ্ধি এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত ব্যথা

(বি.দ্র. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রুগীর সাথে কথা বলে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারের মাধ্যমে ঔষধ পাঠানো হয়)
হুজরীপাড়া (বানকের মোড়), দারুশা, কর্ণহার, রাজশাহী। ০১৭৩৮-১৮২১৪৪ anashomeocare

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الإعتصام 9th Year, 8th Part, June 2025, Price : 30.00